# গুপী গাইন বাঘা বাইন

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী





# গুপী গাইন বাঘা বাইন



# গুপী গাইন
# বাঘা বাইন

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এশিয়া
পাবলিশিং
কোম্পানি
কলিকাতা-বারো

প্রকাশক
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/এ, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি
বিমল দাস

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১, ১৩৭৬
এপ্রিল ১৪, ১৯৬৯

॥ তিন টাকা ॥



বাংলা দেশের শিশু ও কিশোরদের কাছে উপেন্দ্রকিশোরের পরিচয় নতুন করে বলতে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' 'টুনটুনির বই', 'ছেলেদের মহাভারত' 'ছেলেদের রামায়ণ' পড়েনি এমন শিশু ও কিশোর এযুগে বিরল। উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম বয়সের নাম কামদারঞ্জন। জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে—আজকের পূর্বপাকিস্থানের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলায়। ছেলেবেলাতেই দত্তক নিলেন কামদারঞ্জনকে হরিসাধন রায়চৌধুরী বাবা কালীনাথ রায়ের কাছ থেকে। বাড়ি বদলের সংগে সংগে নামেরও বদল হল। কামদারঞ্জন রায় হল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

ছেলেবেলা কাটে ময়মনসিংহে, ওখানকারই স্কুলে পড়তেন উপেন্দ্রকিশোর। লেখাপড়ায় খুবই ভাল ছিলেন—বিশেষ করে বিজ্ঞান আর গণিতে। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে সেকালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে।

ছেলেবেলা থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের বিশেষ মনোযোগ ছিল যন্ত্রপাতির ক্রিয়াপদ্ধতির প্রতি। ছবি আঁকা ও ছবি তোলা দুই-ই ভীষণ ভাবে আকর্ষণ করেছিল কিশোর উপেন্দ্রকিশোরকে। ফটোগ্রাফী নিয়ে অনেক গবেষণাও করেছেন। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িতে একটি অন্ধকার ঘর ছিল তার ডার্ক রুম। দিনের বেশী সময় এই ডার্ক রুমেই কাটত কিশোর উপেন্দ্রকিশোরের। এখানে বসেই ছবি আঁকতেন, বেহালা বাজাতেন, গান করতেন। সবের মাঝেও তাঁর ধ্যান ছিল কি করে ছবি থেকে হাফটোন ব্লক করা যেতে পারে, আরও নিখুঁত ভাবে ছাপা যেতে পারে হাফটোন

# গুপি গাইন ও বাঘা বাইন

তোমরা গান গাইতে পার ? আমি একজন লোকের কথা বলব সে একটা গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল গুপি কাইন, তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন। তার একটা মুদীর দোকান ছিল।, গুপি কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির ক'রে বলত গুপি 'গাইন'।

গুপি যদিও একটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব ক'রেই গাইত ; সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে ঘরে ব'সে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গান গাইত, তখন মাঠের যত গরু সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত। শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁশ নিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চ'লে গেল ; সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতর গিয়ে খুব ক'রে গলা ভাঁজতে লাগল।

গুপিদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু পাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার শখ ছিল। বাজাতে বাজাতে সে বিষম ঢুলতে থাকত, আর পা নাড়ত আর চোখ পাকাত, আর দাঁত খিঁচোত, আর ভ্রূকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ ক'রে থাকত আর বলত, 'আহা!

আ-া-া !! অ-অ-অ-হ্-হ্-হ্ !!!' শেষে যখন 'হাঃ, হাঃ, হা-হা !' ব'লে বাঘের মত খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে প'ড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত 'বাঘা বাইন।' তার এই বাঘা নামই রটে গিয়েছিল ; আসল নাম যে তার কী, তা কেউ জানত না।

বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা ক'রে ঢোলক ভাঙত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বাঘার বাজনা বন্ধ হবে, তাও কি হয় ? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বলল, 'তুমি না পার, না-হয় আমরাই সকলে চাঁদা ক'রে ঢোলকের পয়সাটা দি। আমাদের গ্রামে এমন একটা ওস্তাদ হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে ?' শেষে ঠিক হল যে গ্রামের সকলে চাঁদা ক'রে বাঘাকে একটা ঢোলক কিনে দেবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনি খুব মজবুত হবে, যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছেঁড়ে।

সে যা ঢোলক হল ! তার মুখ হল সাড়ে-তিন হাত চওড়া, আর ছাউনি মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যারপরনাই খুশী হয়ে বললে, 'আমি দাঁড়িয়ে বাজাব।'

তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিনরাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না।' ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিনকতক এইভাবে চললে কী হত বলা যায় না। এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বললে, 'লক্ষ্মী, দাদা। তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চ'লে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব !'

বাঘা আর কী করে ? তখন কাজেই তাকে অন্য একটা গ্রামে

যেতে হল। সেখানে দুদিন না থাকতে থাকতেই সেখানকার সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার ক'রে দিল। তারপর থেকে সে যেখানেই যায় সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন সে করল কি, সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধার সময় তার নিজের গ্রামে গিয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে, আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিয়ে বিদায় ক'রে বলে 'বাঁচলাম!' তারপর এমন হল যে আর কেউ তাকে খেতে দেয় না। আর তার ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে। তখন বেচারা ভাবল, 'আর না! মূর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে চ'লে যাওয়াই ভাল। না-হয় বাঘে খাবে, তবুও আমার বাজনা চলবে!' এই ব'লে বাঘা তার ঢোলটিকে ঘাড়ে ক'রে বনে চ'লে গেল।

এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে। এখন আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দূরে থাক, সে বনে বাঘ-ভালুক কিছু নেই। আছে খালি একটা ভয়ানক জানোয়ার; বাঘা আজও তাকে দেখতে পায় নি, শুধু দূর থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে, আর ভাবে, 'বাবা গো। ওটা এলেই তো ঢোলক-সুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে!'

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু কেউ নয়, সে গুপি গাইন। বাঘা যে ডাক শুনে কাঁপে, সে গুপির গলা ভাঁজা। গুপিও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘারই মত ভয়ে কাঁপে। শেষে একটু ভাবল, 'এ বনে থাকলে কখন প্রাণটা যাবে, তার চেয়ে এই বেলা এখান থেকে পালাই।' এই ভেবে গুপি চুপিচুপি বন থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে আর-একটি লোকও এক বিশাল ঢোল মাথায় ক'রে সেই বনের ভিতর থেকে আসছে। তাকে দেখেই ভারি আশ্চর্য হয়ে গুপি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে?'

বাঘা বললে, 'আমি বাঘা বাইন, তুমি কে?'

গুপি বললে, 'আমি গুপি গাইন। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

বাঘা বললে, 'যেখানে জায়গা জোটে, সেইখানেই যাচ্ছি। গ্রামের লোকগুলো গাধা, গানবাজনা বোঝে না, তাই ঢোলটি নিয়ে বনে চ'লে এসেছিলাম। তা ভাই, এখানে যে ভয়ংকর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না। তাই পালিয়ে যাচ্ছি।'

গুপি বললে, 'তাই তো! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক শুনেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম। বলো তো, তুমি জানোয়ারটাকে কোথায় ব'সে ডাকতে শুনেছিলে?'

বাঘা বললে, 'বনের পূর্বধারে, বটগাছের তলায়।'

গুপি বললে, 'আচ্ছা, সে যে আমারই গান শুনেছ! সে কেন জানোয়ারের ডাক হবে? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনের পশ্চিম ধারে, হরতুকীতলায় ব'সে।'

বাঘা বললে, 'সে তো আমার ঢোলকের আওয়াজ, আমি যে ঐখানে থাকতাম।'

এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের নিজেদের গান আর বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন দুজনার সেকি হাসি! অনেক হেসে তারপর গুপি বললে, 'ভাই, আমি যেমন গাইন, তুমি তেমনি বাইন! আমরা দুজনে জুটলে নিশ্চয় একটা কিছু করতে পারি।'

এ কথায় বাঘারও খুবই মত হল। কাজেই তারা খানিক কথাবার্তার পর ঠিক করল যে, তারা দুজনায় মিলে রাজামশাইকে গান শোনাতে যাবে, রাজামশাই যে তাতে খুব খুশী হবেন, তাতে তো আর ভুলই নেই, চাই কি অর্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে ফেলতে পারেন।

গুপির আর বাঘার মনে এখন খুবই আনন্দ, তারা রাজাকে গান

শুনাতে যাবে। দুজনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল; সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ি যেতে হয়।

নদীতে খেয়া আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায়। বেচারারা বন থেকে এসেছে, পয়সা কোথায় পাবে! তারা বলল, 'ভাই, আমাদের কাছে তো পয়সা-টয়সা নেই, আমরা না-হয় তোমাদের গেয়ে বাজিয়ে শোনাব, আমাদের পার ক'রে দাও।' তাতে খেয়ার চড়নদারেরা খুব খুশী হয়ে নেয়েকে বলল, 'আমরা চাঁদা ক'রে এদের পয়সা দেব, তুমি এদের তুলে নাও।'

বাঘার ঢোলটি দেখেই নেয়েরও বাজনা শুনতে ভারি সাধ হয়েছিল, কাজেই সে এই কথায় আর কোন আপত্তি করল না। গুপিকে আর বাঘাকে তুলে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। নৌকো-ভরা লোক, ব'সে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা হতে হতে নৌকাও নদীর মাঝখানে এসে পড়ল। তারপর খানিক একটু গুনগুনিয়ে গুপি গান ধরল, বাঘা তার ঢোলকে লাঠি লাগাল, আর অমনি নৌকোসুদ্ধ সকল লোক বিষম চমকে গিয়ে গড়াগড়ি আর জড়াজড়ি ক'রে দিল নৌকোখানাকে উল্‌টে।

তখন তো আর বিপদের অন্তই নেই। ভাগ্যিস বাঘার ঢোলকটি এত বড় ছিল, তাই আঁকড়ে ধ'রে দুজনার প্রাণরক্ষা হল। কিন্তু তাদের আর রাজবাড়ি যাওয়া ঘটল না। তারা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে শেষে সন্ধ্যাবেলায় এক ভীষণ বনের ভিতরে গিয়ে কূলে ঠেকল। সে বনে দিনের বেলায় গেলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, রাত্রির তো আর কথাই নেই। তখন বাঘা বলল, 'গুপিদা, বড়ই তো বিষম দেখছি। এখন কি করি বলো তো।' গুপি বলল, 'করব আর কী? আমি গাইব, তুমি বাজাবে। নিতান্তই

যখন বাঘে খা'বে, তখন আমাদের বিদ্যেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন?'

বাঘা বলল, 'ঠিক বলেছ দাদা। মরতে হয় তো ওস্তাদলোকের মতন মরি, পাড়াগেঁয়ে-ভূতের মত মরতে রাজী নই।'

এই ব'লে দুজনায় সেই ভিজা কাপড়েই প্রাণ খুলে গান বাজনা শুরু করল। বাঘার ঢোলটি সেদিন কিনা ভিজা ছিল, তাতেই তার আওয়াজটি হয়েছিল যারপরনাই গম্ভীর। আর গুপিও ভাবছিল, এই তার শেষ গান, কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুবই গম্ভীর হয়েছিল। সে গান যে কী জমাট হয়েছিল, সে আর কী বলব? এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা ক'রে দুপুর রাত হয়ে গেল, তবু তাদের সে গান থামছেই না।

এমন সময় তাদের দুজনারই মনে হল, যেন চারদিকে একটা কী কাণ্ড হচ্ছে। ঝাপসা ঝাপসা কালো কালো, এই বড় বড় কী যেন সব গাছের উপর থেকে উঁকি মারতে লেগেছে; তাদের চোখগুলো জ্বলছে, যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুচ্ছে যেন মুলোর সার। তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজনা থেমে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে দুজনার হাত পা গুটিয়ে, পিঠ বেঁকে, ঘাড় ব'সে চোখ বেরিয়ে মুখ হাঁ ক'রে এল। তাদের গায়ে এমনি কাঁপুনি আর দাঁতে এমনি ঠকঠকি ধ'রে গেল যে, আর তাদের ছুটে পালাবারও জো রইল না।

ভূতগুলি কিন্তু তাদের কিছু করল না। তারা তাদের গানবাজনা শুনে ভারি খুশী হয়ে এসেছে, তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপির আর বাঘার বায়না করতে। গান থামতে দেখে তারা নাকিসুরে বলল, 'থামলি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা!'

এ কথায় গুপির আর বাঘার একটু সাহস হল; তারা ভাবল, 'এ তো মন্দ মজা নয়, তবে একটু গেয়েই দেখি-না।' এই ব'লে যেই

বলল, 'দাও তো দেখি, এক হাঁড়ি পোলাও।' অমনি একটা সুগন্ধ যে বেরুল! তেমন পোলাও রাজারাও সচরাচর খেতে পান না। আর সে কী বিশাল হাঁড়ি। গুপি কি সেটা থলির ভিতর থেকে তুলে আনতে পারে? যা হোক, কোনমতে সেটাকে বার ক'রে এনে তারপর থলিকে বলল, 'ভাজা, ব্যঞ্জন, চাটনি, মিঠাই, দই, রাবড়ি, সরবত।—শিগ্‌গির শিগ্‌গির দাও।' দেখতে দেখতে খাবার জিনিসে আর সোনারূপোর বাসনে ঘর ভ'রে গেল। দুজন লোকে আর কত খাবে? সে অপূর্ব খাবার খেয়ে তাদের গায়ের ব্যথা কোথায় চলে গেল তার ঠিক নেই।

তখন বাঘা বলল, 'দাদা, চলো এই বেলা এখান থেকে পালাই, নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।' গুপি বলল, 'পাগল হয়েছ নাকি? আমাদের এমন জুতো থাকতেই কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? দেখাই যাক-না, কী হয়।' এ কথায় বাঘা খুব খুশি হল; সে বুঝতে পারল যে, গুপিদা একটা-কিছু মজা করবেন।

দু দিন চ'লে গেল, আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন। বিচারের দিন রাত থাকতে উঠে গুপি থলের ভিতর হাত দিয়ে বলল, 'আমাদের দুজনের রাজপোশাক চাই।' বলতেই তার ভিতর থেকে এমন সুন্দর পোশাক বেরুল যে তেমন পোশাক কেউ তয়েরই করতে পারে না। সেই পোশাক তারা দুজনে প'রে, তাদের পুরনো কাপড় আর বাসন কখানি পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে, জুতো পায়ে দিয়ে তারা বলল, 'এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব।' অমনি দেখে, রাজবাড়ির বাইরের প্রকাণ্ড মাঠে চ'লে এসেছে। সে মাঠের এক জায়গায় তাদের পুঁটুলিটা লুকিয়ে রেখে, তারা বেড়াতে বেড়াতে এসে রাজবাড়ির সামনে উপস্থিত হল।

দূর থেকে তাদের আসতে দেখেই রাজার লোক ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, 'মহারাজ, দুজন রাজা আসছেন।' রাজাও

তারা গান ধরেছে, অমনি ভূতেরা একজন দুজন ক'রে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।

সে যে কী কাণ্ডকারখানা হয়েছিল, সে কি না দেখলে বোঝবার জো আছে! গুপি আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনো এমন সমজদারের দেখা পায় নি। সে রাত এমনি ভাবেই কেটে গেল। ভোর হলে তো আর ভূতেদের বাইরে থাকবার জো নেই, কাজেই তার একটু আগেই তারা বলল, 'চল্ বাবা, মোদের গোদার বেটার বে'তে! তোদের খুশি ক'রে দিব।'

গুপি বলল, 'আমরা যে রাজবাড়ি যাব!' ভূতেরা বলল, 'সে যাবি এখন, আগে মোদের বাড়ি একটু গানবাজানা শুনিয়ে যা! তোদের খুশি করে দিব!' কাজেই তখন তারা দুজনে ঢোল নিয়ে ভূতেদের বাড়ি চলল। সেখানে গানবাজনা যা হল, সে আর ব'লে কাজ নেই। তারপর তাদের বিদায় করবার সময় ভূতেরা বলল, 'তোরা কী চাস?'

গুপি বলল, 'আমরা এই চাই যে আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুশি করতে পারি।' ভূতেরা বলল, 'তাই হবে, তোদের গানবাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়ার আগে কেউ সেখান থেকে উঠে যেতে পারবে না। আর কী চাস?'

গুপি বলল, 'আর এই চাই যে আমাদের যেন খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়।' এ কথায় ভূতেরা তাদের একটি থলে দিয়ে বলল, 'তোরা যখন যা খেতে বা পরতে চাস, এই থলের ভিতরে হাত দিলেই তা পাবি। আর কী চাস?'

গুপি বলল, 'আর কী চাইব, তা তো বুঝতে পারছি না।' তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দুজনকে দুজোড়া জুতো এনে দিয়ে বলল, 'এই জুতো পায়ে দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি।'

তা শুনে তাঁর ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঘা আর গুপি আসতেই তিনি তাদের যারপরনাই আদর দেখিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। চমৎকার একটি ঘরে তাদের বাসা দেওয়া হল। কত চাকর, বামুন, পেয়াদা, পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল, তার অন্ত নেই।

তারপর গুপি আর বাঘা হাত-পা ধুয়ে জলযোগ ক'রে একটু ঠাণ্ডা হলেই রাজামশাই আবার তাদের খবর নিতে এলেন। তাদের পোশাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিয়েছেন যে, 'না-জানি এঁরা কত বড় রাজাই হবেন।' তারপর শেষে যখন তিনি গুপিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'আপনারা কোন্ দেশের রাজা ?' তখন গুপি হাত জোড় ক'রে তাঁকে বলল, 'মহারাজ ! আমরা কি রাজা হতে পারি ? আমরা আপনার চাকর !'

গুপি সত্য কথাই বলেছিল, কিন্তু রাজার তাতে বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন, 'কী ভালমানুষ, কেমন নরম হয়ে কথা বলে। যেমন বড় রাজা তেমনি ভদ্রলোকও দেখছি।' তিনি তখন আর বিশেষ কিছু না ব'লে তাদের দুজনকে তাঁর সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সেদিন সে দুটো লোকের বিচার হবে—তিন দিন আগে যারা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকেছিল। বিচারের সময় উপস্থিত, আসামী দুটোকে আনতে পেয়াদা গিয়েছে; কিন্তু তাদের আর কোথায় পাবে ? এ তিন দিন তাদের ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলে দেখা হল, সেখানে কেউ নেই, খালি ঘর প'ড়ে আছে।

তখন তো ভারি একটা ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি প'ড়ে গেল। দারোগামশাই বিষম ক্ষেপে গিয়ে পেয়াদাগুলোকে বকতে লাগলেন। পেয়াদারা হাত জোড় ক'রে বলল, 'হুজুর! আমাদের কোনো কসুর নেই; আমরা তালা দিয়ে রেখেছিলাম, তার উপর আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ও দুটো তো মানুষ

ছিল না, ও দুটো ছিল ভূত; নইলে এর ভিতর থেকে কী ক'রে পালাল?'

এ কথায় সকলেরই বিশ্বাস হল। রাজামশাইও প্রথমে দারোগার উপর রেগে তাঁকে কেটেইফেলতে গিয়েছিলেন, শেষে ঐ কথা শুনে বললেন, 'ঠিক, ও দুটো নিশ্চয় ভূত। আমার ঘরও তো বন্ধ ছিল, তার ভিতর এত বড় ঢোল নিয়ে কী ক'রে ঢুকেছিল?'

তা শুনে সকলেই বলল, 'হাঁ, হাঁ, ঠিক ঠিক, ও দুটো ভূত!' বলতে বলতেই তাদের শরীর শিউরে উঠল, গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। তখন তারা বাঘার সেই ঢোলকটির কথা মনে করে বলল, 'মহারাজ! ভূতের ঢোল বড় সর্বনেশে জিনিস! ওটাকে কখনো আপনার ঘরে রাখবেন না। ওটাকে এখনি পুড়িয়ে ফেলুন।'

রাজামশাইও বললেন, 'বাপ রে! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব? এক্ষুণি ওটাকে এনে পোড়াও।

যেই এ কথা বলা, অমনি বাঘা দু হাতে চোখ ঢেকে 'হাউ হাউ' 'হাউ হাউ' ক'রে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল!

সেদিন বাঘাকে নিয়ে গুপির কী মুশকিলই হয়েছিল। ঢোল পোড়াবার নাম শুনেই বাঘা কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঢোল এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে না-জানি সে কী করবে। তখন, সেটা যে তারই ঢোল, সে কথা কি আর বাঘা সামলে রাখতে পারবে? কী সর্বনাশ! এখন বুঝি ধরা প'ড়ে প্রাণটাই হারাতে হয়।

গুপির বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল যে বাঘাকে নিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু তার তো আর জো নেই; সভায় বসবার সময় যে সেই জুতোগুলো পা থেকে খুলে রাখা হয়েছে।

এদিকে কিন্তু বাঘার কাণ্ড দেখে সভাময় এক বিষম হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে। সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয় একটা ভারী অসুখ হয়েছে, আর সে বাঁচবে না। রাজবাড়ির বদ্যিঠাকুর এসে বাঘার

নাড়ী দেখে যারপরনাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। বাঘাকে খুব ক'রে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর বদ্যিঠাকুর বললেন যে, 'এতে যদি বেদনা না সারে, তবে পিঠে আর-একটা, তাতেও না সারলে দুপাশে আর দুটো বেলেস্তারা লাগাতে হবে।'

এ কথা শুনেই বাঘার কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তখন সকলে ভাবল যে, বদ্যিঠাকুর কী চমৎকার ওষুধই দিয়েছেন, দিতে দিতেই বেদনা সেরে গেছে।

যা হোক, বাঘা তখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোল পোড়াবার কথাটা চাপা প'ড়ে গেছে, তখন সেই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মনটা কতক ঠাণ্ডা হল। রাজামশাই তখন তাকে খুব যত্নের সহিত তার ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন ; গুপি তার কাছে ব'সে তার বেলেস্তারায় হাওয়া করতে লাগল।

তারপর সকলে ঘর থেকে চলে গেলে গুপি বাঘাকে বলল, 'ছিঃ, ভাই, যেখানে-সেখানে কি এমন ক'রে কাঁদতে আছে ? দেখ দেখি, এখন কী মুশকিলটা হল।' বাঘা বলল, 'আমি যদি না কাঁদতুম, তা হলে তো এতক্ষণে আমার ঢোলকটি পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিত। এখন না-হয় একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, কিন্তু আমার ঢোলকটা তো বেঁচে গেছে!'

বাঘা আর গুপি এমনি কথাবার্তা বলছে। এদিকে রাজামশাই সভায় ফিরে এলে দারোগামশাই তাঁর কানে কানে বললেন, 'মহারাজ, একটা কথা আছে, অনুমতি হয় তো বলি।' রাজা বললেন, "কী কথা ?' দারোগা বললেন, 'মহারাজ, ঐ যে লোকটা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, সে আর তার সঙ্গের ঐ লোকটা, সেই দুই ভূত ; আমি তাদের চিনতে পেরেছি।' রাজা বললেন, 'তাই তো হে, আমারও একটু যেন সেই রকমই ঠেকছিল। তা' হলে তো বড় মুশকিল দেখছি। বলো তো এখন কী করা যায় ?'

তখন একথা নিয়ে সভার মধ্যে ভারি একটা কানাকানি শুরু হল। কেউ বলল, 'রোজা ডাকো, ও দুটোকে তাড়িয়ে দিক।' আর-একজন বলল, 'রোজা যদি তাড়াতে না পারে, তখন তো সে দুটো ক্ষেপে গিয়ে একটা বিষম কিছু করতে পারে। তার চেয়ে কেন রাত্রে ঘুমের ভিতরে ও দুটোকে পুড়িয়ে মারুন না।'

এ কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল, কিন্তু এর- মধ্যে একটু মুশকিল এই দেখা গেল যে, ভূতদের পোড়াতে গেলে রাজবাড়িতেও তখন আগুন ধ'রে যেতে পারে। শেষে অনেক যুক্তির পর এই স্থির হল যে, একটা বাগানবাড়িতে তাদের বাসা দেওয়া হবে; বাগানবাড়ি পোড়া গেলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। তখন রাজামশাই বললেন যে, 'সেই ঢোলকটাকেও তা হলে সেই বাগানবাড়িতে নিয়ে রাখা যাক; বাগানবাড়ি পোড়াবার সময় একসঙ্গে সকল আপদ চুকে যাবে।'

বাগানবাড়ি যাবার কথা শুনে গুপি আর বাঘা খুব খুশী হল। তারা তো জানে না যে এর ভিতরে কী ভয়ানক ফন্দি রয়েছে; তারা খালি ভাবল যে বেশ আরামে নিরিবিলি থাকা যাবে, সংগীতচর্চারও সুবিধা হতে পারে। জায়গাটি খুবই নিরিবিলি আর সুন্দর! বাড়িটি কাঠের, কিন্তু দেখতে চমৎকার। সেখানে গিয়ে দেখতে দেখতে বাঘা ভাল হয়ে গেল। তখন গুপি তাকে বলল, 'ভাই, আর এখানে থেকে কাজ কী? চলো, আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।' বাঘা বলল, 'দাদা, এমন সুন্দর যায়গায় তো আর থাকতে পাব না, দুদিন এখানে রইলামই বা। আহা, আমার ঢোলকটি যদি থাকত!'

সে দিন বাঘা বাড়ির এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপি বাগানের এক জায়গায় ব'সে গুনগুন করছে, এমন সময় হঠাৎ বাঘা ভয়ানক চেঁচামেচি ক'রে উঠল। তার সকল কথা বোঝা গেল না, খালি 'ও গুপিদা! ও গুপিদা!' ডাকটা খুবই শোনা যেতে লাগল। গুপি

তখন ছুটে এসে দেখল যে, বাঘা তার সেই ঢোলকটা মাথায় ক'রে পাগলের মত নাচছে, আর যা-তা আবোল-তাবোল বলতে বলতে 'গুপিদা গুপিদা' ব'লে চেঁচাচ্ছে। ঢোলক পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে, সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। এমনি ক'রে প্রায় আধঘণ্টা চ'লে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বলল, 'গুপিদা, দেখছ কি, এই ঘরে আমার ঢোলকটি—আর কী মজা—হাঃ হাঃ হাঃ' ব'লে আবার সে মিনিট দশেক খুব নেচে নিল। তারপর সে বলল, 'দাদা, এত দুঃখের পর ঢোলকটি পেয়েছি, একটা গান গাও, একটু বাজিয়ে নি।' গুপি বলল, 'এখন নয় ভাই, এখন বড্ড খিদে পেয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রে বারান্দায় ব'সে দুজনায় খুব ক'রে গানবাজনা করা যাবে।

রাজামশাই কিন্তু ঠিক করেছেন, সেই রাত্রেই তাদের পুড়িয়ে মারবেন। দারোগার উপর হুকুম হয়েছে যে, সেদিন সন্ধ্যার সময় সেই বাগানবাড়িতে মস্ত ভোজের আয়োজন করতে হবে। দারোগা-মশায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন, খাওয়াদাওয়ার পর গুপি আর বাঘা ঘুমিয়ে পড়লে, তাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে সেই কাঠের বাড়ির চারদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করবেন।

সেদিনকার খাওয়া বেশ ভালমতই হল। গুপি আর বাঘা ভাবল যে, লোকজন চ'লে গেলেই তারা গানবাজনা আরম্ভ করবে, দারোগামশাই ভাবলেন যে, গুপি আর বাঘা ঘুমোলেই ঘরে আগুন দেবেন। তিনি তাদের ঘুম পাড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তারা না ঘুমোলে তিনি সেখান থেকে যাবেন না, তখন গুপি বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় প'ড়ে নাক ডাকাতে লাগল।

একটু পরেই গুপি আর বাঘা দেখল যে লোকজন সব চ'লে

গেছে, আর কারু সাড়াশব্দ নেই। তারপর আর-একটু দেখে, যখন মনে হল যে বাগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা দুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান জুড়ে দিল।

এদিকে দারোগামশাই তাঁর লোকদের ব'লে দিয়েছেন, 'তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভাল ক'রে আগুন ধরাবি; খবরদার, আগুন ভাল ক'রে না ধরলে চ'লে যাস নি যেন!' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভাল মতই ধরেছে। দারোগামশাই ভাবছেন 'এই বেলা ছুটে পালাই'। এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপিও গান ধ'রে দিল। তখন আর দারোগামশাই বা তাঁর লোকদের কারু সেখান থেকে নড়বার জো রইল না, সকলকেই পুড়ে মরতে হল। ততক্ষণে গুপি আর বাঘাও আগুন দেখতে পেয়ে, তাদের জুতোর জোরে, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

সেদিনকার আগুনে দারোগামশাই তো পুড়ে মারা গিয়েছিলেনই, তাঁর দলের অতি অল্পলোকই বেঁচেছিল। সেই লোকগুলো গিয়ে রাজামশাইকে এই ঘটনার খবর দিতে তাঁর মনে বড়ই ভয় হল। পরদিন আর দুচারজন লোক রাজসভায় এসে বলল যে, তারা সেই আগুনের তামাশা দেখতে সেখানে গিয়েছিল; তারা তখন ভারি আশ্চর্য রকমের গানবাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে শূন্যে উড়ে পালাতে স্বচক্ষে দেখেছে। তখন যা রাজামশায়ের কাঁপুনি! সেদিন তাঁর সভা করা হল না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে এসে ভূতের ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন, একমাসের ভিতরে আর বাইরে এলেন না।

এদিকে গুপি আর বাঘা সেই আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ির কাছের সেই বনে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল। তাদের বড় ইচ্ছা যে এত



ঘটনার পর একবার তাদের মা-বাপকে দেখে যায়। বনে এসেই বাঘা বলল, 'গুপিদা, এইখানে না তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল ?' গুপি বলল, 'হাঁ !' বাঘা বলল, 'তবে এমন জায়গায় এসে কি একটু গানবাজনা না করে চলে যেতে আছে ?' গুপি বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই। তবে আর দেরি কেন ? এই বেলা আরম্ভ ক'রে দাও।' এই ব'লে তারা প্রাণ খুলে গানবাজনা করতে লাগল।

এর মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা হয়েছে। এক দল ডাকাত হাল্লার রাজার ভাণ্ডার লুটে, তার ছোট ছেলে ছুটিকে সুদ্ধ চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটেও ধরতে পারছিলেন না। গুপি আর বাঘা যখন গান ধরেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলোও সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে গান একবার শুনলে তো আর তার শেষ অবধি না শুনে চ'লে যাবার জো নেই ; কাজেই ডাকাতদের তখনি সেখানে দাঁড়াতে হল। সারা রাত্রের ভিতরে আর সে গানবাজনাও থামল না, ডাকাতদেরও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না। সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধ'রে ফেললেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে গুপি আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন, তখন আর তাদের আদর দেখে কে ? রাজ-কুমারেরাও বললেন, 'বাবা, এমন আশ্চর্য গান আর কখ্খনো শোন নি ; এদের সঙ্গে নিয়ে চলো।' কাজেই রাজা গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে চলো ! তোমাদের পাঁচশো টাকা ক'রে মাইনে হল।'

এ কথায় গুপি জোড়হাতে রাজামশাইকে নমস্কার ক'রে বলল, 'মহারাজ, দয়া ক'রে আমাদের দুদিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা আমাদের পিতামাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হব।' রাজা বললেন, 'আচ্ছা, এ দুদিন

আমরা এই বনেই বিশ্রাম করছি ; তোমরা তোমাদের মা-বাপকে দেখে দুদিন পরে এসে এইখানেই আমাদের পাবে।'

গুপিকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তার জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল, কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার বড় আনন্দ হল। কিন্তু বাঘা বেচারার ভাগ্যে সে সুখ মেলে নি। তার মা-বাপ এর কয়েক-দিন আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা তাকে ঢোল মাথায় ক'রে আসতে দেখেই বলল, 'ঐ রে! সেই বাঘা বেটা আবার আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মারবে ; মার বেটাকে!' বাঘা বিনয় ক'রে বলল, 'আমি খালি আমার মা-বাবাকে দেখতে এসেছি ; দুদিন থেকেই চ'লে যাব, বাজাব-টাজাব না।' সে কথা কি তারা শোনে? তারা দাঁত খিঁচিয়ে তার মা-বাপের মৃত্যুর কথা ব'লে এই বড় লাঠি নিয়ে তাকে মারতে এল, সে প্রাণপণে ছুটে পালাতে পালাতে ইট মেরে তার পা ভেঙে মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি ক'রে দিল।

গুপি তাদের ঘরের দাওয়ায় ব'সে তার বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সে দেখল যে বাঘা পাগলের মত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে ; তার কাপড় ছিড়ে ফালি ফালি আর রক্তে লাল হয়ে গেছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? তোমার এ দশা কেন?' গুপিকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে। তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাদা, বড্ড বেঁচে এসেছি! মূর্খগুলো আর একটু হলেই আমার ঢোলটি ভেঙে দিয়েছিল!' গুপিদের বাড়ি এসে গুপির যত্নে আর তার মা-বাপের আদরে বাঘার দুদিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল। দুদিন পরে গুপি তার মা-বাপের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ব'লে গেল, 'তোমরা তয়ের হয়ে থাকবে ; আমি আবার ছুটি পেলেই এসে তোমাদের নিয়ে যাব।'

তারপর কয়েক মাস চ'লে গিয়েছে। গুপি আর বাঘা এখন

হাল্লার রাজার বাড়িতে পরম সুখে বাস করে। দেশ বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে—'এমন ওস্তাদ আর কখনো হয় নি, হবেও না।' রাজামশাই তাদের ভারি ভালবাসেন; তাদের গান না শুনে একদিনও থাকতে পারেন না। নিজের দুঃখ সুখের কথা সব গুপির কাছে বলেন। একদিন গুপি দেখল রাজামশায়ের মুখখানি বড়ই মলিন। তিনি ক্রমাগতই যেন কী ভাবছেন, যেন তাঁর কোন বিপদ হয়েছে। শেষে একবার তিনি গুপিকে বললেন, 'গুপি, বড় মুশকিলে পড়েছি, কী হবে জানি না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে।'

শুণ্ডীর রাজা হচ্ছেন সেই তিনি, যিনি গুপি আর বাঘাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাম শুনেই গুপির মনে একটা চমৎকার মতলব এল। সে তখন রাজামশাইকে বলল, 'মহারাজ! এর জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনার এই চাকরকে হুকুম দিন, আমি এ থেকে হাসির কাণ্ড ক'রে দেব।' রাজা হেসে বললেন, 'গুপি, তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, যুদ্ধের ধারও ধার না, তার কিছু বোঝও না। শুণ্ডীর রাজার বড় ভারী ফৌজ, আমি কি তার কিছু করতে পারি?' গুপি বলল, 'মহারাজ, হুকুম পেলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। ক্ষতি তো কিছু হবে না।' রাজা বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।' এ কথায় গুপি যারপরনাই খুশী হয়ে বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল।

গুপি আর বাঘা সেদিন অনেকক্ষণ ধ'রে পরামর্শ করেছিল। বাঘার তখন কতই উৎসাহ! সে বলল, 'দাদা, এবারে আমরা দুজনে মিলে একটা কিছু করবই করব। আমার শুধু এক কথায় একটু ভয় হচ্ছে; হঠাৎ যদি প্রাণ নিয়ে পালাবার দরকার হয়, তবে হয়তো আমি জুতোর কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মত কষে ছুট দিতে যাব, আর মার খেয়ে সারা হব। এমনি ক'রে

দেখ-না সেবারে আমাদের গাঁয়ের মূর্খগুলোর হাতে আমার কী দশা হ'ল !'

যা হোক, গুপির কথায় বাঘার সে ভয় কেটে গেল, আর পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল। দিনকতক ধ'রে রোজ রাত্রে তারা শুণ্ডী চ'লে যায়, আর রাজবাড়ির আশেপাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয়। যুদ্ধের আয়োজন যা দেখতে পেল সে বড়ই ভয়ংকর ; এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নেই। রাজার ঠাকুরবাড়িতে রোজ মহাধুমধামে পুজো হচ্ছে। দশ দিন এমনিতর পুজো দিয়ে, ঠাকুরকে খুশী ক'রে তারা হাল্লায় রওনা হবে।

গুপি আর বাঘা এর সবই দেখল, তারপর একদিন তাদের ঘরে ব'সে দরজা এঁটে, সেই ভূতের দেওয়া থলিটিকে বলল, 'নূতন ধরনের মিঠাই চাই, খুব সরেস।' সে কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যা বেরুল, সে আর বলবার নয়। তেমনি মিঠাই কেউ খায় নি, চোখেও দেখেনি। সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপি শুণ্ডীর রাজার ঠাকুরবাড়ির বিশাল মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে বসল। নীচে খুব পুজোর ধূম—ধূপধুনো শঙ্খঘণ্টা কোলাহলের সীমা নেই, আঙিনায় লোকে লোকারণ্য। সেই সব লোকের মাথার উপরে ঝড়াৎ ক'রে মিঠাই-গুলো ঢেলে দিয়ে বাঘা আর গুপি মন্দিরের চুড়ো আঁকড়ে ব'সে তামাশা দেখতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ধূপধুনো আর আলোর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কেউ তাদের দেখতে পেল না।

মিঠাইগুলো আঙিনায় পড়তেই অমনি কোলাহল থেমে গেল। অনেকেই লাফিয়ে উঠল, কেউ কেউ চেঁচিয়ে ছুটও দিল। তারপর দু-চারজন সাহসী লোক কয়েকটা মিঠাই তুলে, আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। শেষে তাদের একজন চোখ বুঁজে তার একটু মুখে পুরে দিল ; দিয়েই আর কথাবার্তা নেই—সে দু হাতে আঙিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর নাচছে আর

আহ্লাদে চেঁচাচ্ছে। তখন সেই আঙিনা-সুদ্ধ লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মত কাড়াকাড়ি আর কিচিরমিচির করতে লাগল।

এদিকে কয়েকজন ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে বলেছে যে, 'মহারাজ! ঠাকুর আজ পুজোয় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যে কী অপূর্ব প্রসাদ, সে কথা আমরা বলতেই পারছি না।' সে কথা শুনবামাত্রই রাজামশাই প্রাণপণে কাছা গুঁজতে গুঁজতে উর্ধ্বশ্বাসে এসে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু হায়! ততক্ষণে সব প্রসাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত উঠোন ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইয়ের জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না। তখন তিনি ভারি চটে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের কী অন্যায়। পুজো করি আমি, আর প্রসাদ খেয়ে শেষ কর তোমরা! আমার জন্যে একটু গুঁড়োও রাখ না! তোমাদের সকলকে ধ'রে শূলে চড়াব!' এ কথায় সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে বলল, 'দোহাই মহারাজ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ করতে পারি? বাপ রে! আমরা খেতে না খেতেই ঝাঁ ক'রে কোন্‌খান দিয়ে ফুরিয়ে গেল! আজ আমাদের প্রসাদগুলো আপনি মাপ করুন; কালকের যত প্রসাদ, সব মহারাজ একাই খাবেন!' রাজা তাতে বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। খবরদার। মনে থাকে যেন।'

পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন, তাই একপ্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় এসে আকাশের পানে তাকিয়ে ব'সে আছেন। আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে ব'সে তাঁকে ঘিরে তামাশা দেখছে। আজ পুজোর ঘটা অন্যদিনের চেয়ে শতগুণ; সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুশী হয়ে রাজামশাইকে আরো ভাল প্রসাদ দেবেন।

রাত-দুপুরের সময় গুপি আর বাঘা আরো আশ্চর্য রকমের মিঠাই

নিয়ে এসে মন্দিরের চুড়োয় বসল। আজ তাদের পরনে খুব জমকালো পোশাক, মাথায় মুকুট, গলায় হার, হাতে বালা, কানে কুণ্ডল ; তারা দেবতা সেজে এসেছে। ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু রাজামশাই আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় গুপি আর বাঘা হাসতে হাসতে তাঁর উপরে সেই মিঠাই গুলো ফেলে দিল। তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা চিৎকার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সামলিয়ে নিয়ে, দু হাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন, আর ধেই ধেই ক'রে নাচনটা যে নাচলেন !

এমন সময় গুপি আর বাঘা হঠাৎ মন্দিরের চুড়ো থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সকলে 'ঠাকুর এসেছেন' 'ঠাকুর এসেছেন' ব'লে কে আগে গড় করবে ভেবে ঠিক পায় না ; রাজামশাইতো লম্বা হয়ে মাটিতে প'ড়েই রয়েছেন, আর খালি মাথা ঠুকছেন। গুপি তাঁকে বলল, 'মহারাজ ! তোমার নাচ দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি ; এসো তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি।' রাজা তা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন ; দেবতার সঙ্গে কোলাকুলি, সে কি কম সৌভাগ্যের কথা ?

কোলাকুলি আরম্ভ হল। সকলে 'জয় জয়' বলে চেঁচাতে লাগল। সেই অবসরে গুপি আর বাঘা রাজামশাইকে খুব ক'রে জড়িয়ে ধ'রে বলল, 'এখন তবে আমাদের ঘরে যাব !' বলতে বলতেই তারা তাঁকে সুদ্ধ একেবারে এসে তাদের নিজের ঘরে উপস্থিত। ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় সেই লোকগুলো অনেকক্ষণ ধ'রে হাঁ ক'রে আকাশের পানে চেয়ে রইল। তারপর যখন রাজামশাই আর ফিরলেন না, তখন তারা যে যার ঘরে এসে বলল, 'কী আশ্চর্যই দেখলাম ! রাজামশাই সশরীরে স্বর্গে গেলেন ! দেবতারা নিজে তাঁকে নিতে এসেছিলেন !

এদিকে রাজামশাই গুপি আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তাঁর জ্ঞান হয় নি। ভোরের বেলায় তিনি চোখ মেলে দেখলেন যে, সেই দু'টো ভূত তাঁর মাথার কাছে ব'সে আছে। অমনি তিনি তাদের পায়ে প'ড়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'দোহাই বাবা! আমাকে খেয়ো না! আমি দুশো মোষ মেরে তোমাদের পুজো করব।'

গুপি বলল, 'মহারাজ, আপনার কোনো ভয় নেই। আমরা ভূতও নই, আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না।' রাজামশাইয়ের কিন্তু তাতে একটুও ভরসা হল না। তিনি আর কোনো কথা না ব'লে মাথা গুঁজে ব'সে কাঁপতে লাগলেন।

এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বলল, 'কাল রাত্রে আমরা শুণ্ডীর রাজাকে ধ'রে এনেছি; এখন কী আজ্ঞা হয়?' হাল্লার রাজা বললেন, 'তাঁকে নিয়ে এসো।'

দুই রাজায় যখন দেখা হল, তখন শুণ্ডীর রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ধ'রে এনেছে। হাল্লা জয় করা তো তাঁর ভাগ্যে ঘটলই না, এখন প্রাণটিও যাবে। কিন্তু হাল্লার রাজা তাঁকে প্রাণে না মেরে শুধু তাঁর রাজ্যই কেড়ে নিলেন। তারপর তিনি গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয়তো আমার রাজ্যও যেত, প্রাণও যেত। আমি আর তোমাদের কী উপকার করতে পারি? শুণ্ডীরাজ্যের অর্ধেক আর আমার দুটি কন্যা তোমাদের দুজনকে দান করলাম।'

তখন খুবই একটা ধুমধাম হল। গুপি আর বাঘা হাল্লার রাজার জামাই হয়ে আর শুণ্ডীর অর্ধেক রাজ্য পেয়ে পরম আনন্দে সংগীতের চর্চা করতে লাগল। গুপির মা-বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে?

# জোলা আর সাত ভূত

এক জোলা ছিল, সে পিঠে খেতে বড় ভালবাসত।

একদিন সে তার মাকে বলল, 'মা, আমার বড্ড পিঠে খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে পিঠে করে দাও।'

সেইদিন তার মা তাকে লাল-লাল, গোল-গোল, চ্যাপটা-চ্যাপটা সাতখানি চমৎকার পিঠে করে দিল। জোলা সেই পিঠে পেয়ে ভারি খুশী হয়ে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

জোলার মা বলল, 'খালি নাচবিই যদি, তবে খাবি কখন?'

জোলা বলল, 'খাব কি এখানে? সবাই যেখানে দেখতে পাবে, সেখানে গিয়ে খাব।' ব'লে জোলা পিঠেগুলি নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

নাচতে নাচতে জোলা একেবারে সেই বটগাছতলায় চলে এল, যেখানে হাট হয়। সেই গাছের তলায় এসে সে খালি নাচছে আর বলছে,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

এখন হয়েছে কি—সেই গাছে সাতটা ভূত থাকত। জোলা 'সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব' বলছে, আর তা শুনে তাদের তো বড্ডই ভয় লেগেছে। তারা সাতজনে গুটিশুটি হয়ে কাঁপছে, আর বলছে, 'ওরে সর্বনাশ হয়েছে। ঐ দেখ, কোত্থেকে এক বিটকেল

ব্যাটা এসেছে, আর বলছে আমাদের সাতজনকেই চিবিয়ে খাবে! এখন কী করি বল্ তো!'

অনেক ভেবে তারা একটা হাঁড়ি নিয়ে জোলার কাছে এল। এসে জোড়হাত করে তাকে বলল, 'দোহাই কর্তা! আমাদের চিবিয়ে খাবেন না। আপনাকে এই হাঁড়িটি দিচ্ছি, এইটি নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন!'

সাতটা মিশমিশে কালো তালগাছপানা ভূত, তাদের কুলোর মত কান, মুলোর মত দাঁত, চুলোর মত চোখ,—তারা জোলার সামনে এসে কাঁইমাই করে কথা বলছে দেখেই তো সে এমনি চমকে গেল যে সেখান থেকে ছুটে পালাবার কথা তার মনেই এল না। সে বলল, 'হাঁড়ি নিয়ে আমি কী করব?'

ভূতেরা বলল, 'আজ্ঞে, আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে, তাই এই হাঁড়ির ভিতর পাবেন।'

জোলা বলল, 'বটে! আচ্ছা আমি পায়েস খাব।'

বলতে বলতেই সেই হাঁড়ির ভিতর থেকে চমৎকার পায়েসের গন্ধ বেরুতে লাগল। তেমন পায়েস জোলা কখনও খায়নি, তার মাও খায়নি, তার বাপও খায়নি। কাজেই জোলা যারপরনাই খুশী হয়ে হাঁড়ি নিয়ে সেখান থেকে চলে এল, আর ভূতেরা ভাবল, 'বাবা! বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

তখন বেলা অনেক হয়েছে, আর জোলার বাড়ি সেখান থেকে ঢের দূরে। তাই জোলা ভাবল, 'এখন এই রোদে কী করে বাড়ি যাব? বন্ধুর বাড়ি কাছে আছে, এবেলা সেইখানেই যাই; তারপর বিকেলে বাড়ি যাব এখন।'

বলে সে তো তার বন্ধুর বাড়ি এসেছে। সে হতভাগা কিন্তু ছিল দুষ্টু। সে জোলার হাঁড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁড়ি কোত্থেকে আনলি রে?'

জোলা বলল, 'বন্ধু, এ যে-সে হাঁড়ি নয়, এর ভারি গুণ।'

বন্ধু বলল, 'বটে? আচ্ছা দেখি তো কেমন গুণ।'

জোলা বলল, 'তুমি যা খেতে চাও, তাই আমি এর ভিতর থেকে বার করে দিতে পারি।'

বন্ধু বলল, 'আমি রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, সরভাজা, মালপুয়া, পান্তুয়া, কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গজা, মতিচুর, জিলিপি, অমৃতি, বরফি, চমচম এইসব খাব।'

জোলার বন্ধু যা বল্‌ছে, জোলা হাঁড়ির ভিতর হাত দিয়ে তাই বার করে আনছে। এসব দেখে তার বন্ধু ভাবল যে এ জিনিসটি চুরি না করলে হচ্ছে না।

তখন সে জোলাকে কতই আদর করতে লাগল। পাখা এনে তাকে হাওয়া করল, গামছা দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল, আর বলল, 'আহা ভাই, তোমার কী কষ্টই হয়েছে! গা দিয়ে ঘাম বেয়ে পড়ছে। একটু ঘুমোবে ভাই? বিছানা করে দেব?'

সত্যি সত্যিই জোলার তখন ঘুম পেয়েছিল; কাজেই সে বলল, 'আচ্ছা, বিছানা করে দাও।'

তখন তার বন্ধু বিছানা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে, তার হাঁড়িটি বদ্‌লে তার জায়গায় ঠিক তেমনি ধরনের আর একটা হাঁড়ি রেখে দিল। জোলা তার কিছুই জানে না, সে বিকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ি চলে এসেছে আর তার মাকে বলছে, 'দেখো মা, কী চমৎকার একটা হাঁড়ি এনেছি। তুমি কি খাবে মা? সন্দেশ খাবে? পিঠে খাবে? দেখো আমি এর ভিতর থেকে সে সব বার করে দিচ্ছি।'

কিন্তু এ তো আর সে হাঁড়ি নয়, এর ভিতর থেকে সে-সব জিনিস বেরুবে কেন? মাঝখান থেকে জোলা বোকা ব'নে গেল, তার মা তাকে বকতে লাগল।

তখন তো জোলার বড্ড রাগ হয়েছে, আর সে ভাবছে 'সেই

ভূত ব্যাটাদেরই এ কাজ।' তার বন্ধু যে তাকে ঠকিয়েছে, একথা তার মনেই হল না।

কাজেই পরদিন সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব !'

তা শুনে আবার ভূতগুলো কাঁপতে কাঁপতে একটা ছাগল নিয়ে এসে তাকে হাতজোড় করে বলল, 'মশাই গো ! আপনার পায়ে পড়ি, এই ছাগলটা নিয়ে যান। আমাদের ধরে খাবেন না !'

জোলা বলল, 'ছাগলের কি গুণ ?'

ভূতরা বলল, 'ওকে সুড়সুড়ি দিলে ও হাসে, আর ওর মুখ দিয়ে খালি মোহর পড়ে।'

অমনি জোলা ছাগলের গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। আর ছাগলটাও 'হিহি হিহি' করে হাসতে লাগল, আর মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে খালি মোহর পড়তে লাগল। তা দেখে জোলার মুখে তো আর হাসি ধরে না। সে ছাগল নিয়ে ভাবল যে এ জিনিসটা বন্ধুকে না দেখালেই নয়।

সেদিন তার বন্ধু তাকে আরো ভাল বিছানা করে দিয়ে দুহাতে দুই পাখা নিয়ে হাওয়া করল। জোলার ঘুমও হল তেমনি। সেদিন আর সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙল না। তার বন্ধু তো এর মধ্যে কখন তার ছাগল চুরি ক'রে তার জায়গায় আর একটা ছাগল রেখে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর জোলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তার বন্ধুর সেই ছাগলটা নিয়ে বাড়ি এল ; এসে দেখল যে তার মা তার দেরি দেখে ভারি চটে আছে। তা দেখে সে বলল, 'রাগ আর করতে হবে না, মা ; আমার ছাগলের গুণ দেখলে খুশী হয়ে নাচবে !'

বলেই সে ছাগলের বগলে আঙ্গুল দিয়ে বলল, 'কাঁতু কুঁতু কুতু কুতু কুতু !!!'

ছাগল কিন্তু তাতে হাসলো না, তার মুখ দিয়ে মোহরও বেরুল না। জোলা আবার তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, 'কাঁতু কুঁতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু !!'

তখন সেই ছাগল রেগে গিয়ে শিং বাগিয়ে তার নাকে এমনি বিষম গুঁতো মারল যে সে চিত হয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল। আর তার নাক দিয়ে রক্তও পড়ল প্রায় আধ সের তিন পোয়া। তার উপর আবার তার মা তাকে এমন বকুনি দিল যে তেমন বকুনি সে আর খায়নি !

তাতে জোলার রাগ যে হল, সে আর কি বলব। সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, ছুটো খাব'
সাত বেটাকেই:চিবিয়ে খাব !'

বেটারা আমাকে ছুবার ছুবার ফাঁকি দিয়েছিস, ছাগল দিয়ে আমার নাক থেঁতলা করে দিয়েছিস,—আজ আর তোদের ছাড়ছি নে !'

ভূতেরা তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কি মশাই, আমরা কী করে আপনাকে ফাঁকি দিলুম, আর ছাগল দিয়েই বা কী করে আপনার নাক থেঁতলা করলুম ?'

জোলা তার নাক দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ না, গুঁতো মেরে সে আমার কী দশা করেছে। তোদের সব কটাকে চিবিয়ে খাব !'

ভূতেরা বলল, 'সে কখনো আমাদের ছাগল নয়। আপনি কি এখান থেকে সোজাসুজি বাড়ি গিয়েছিলেন ?'

জোলা বলল, 'না, আগে বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলুম। সেখানে খানিক ঘুমিয়ে তারপর বাড়ি গিয়েছিলুম।'

ভূতেরা বলল, 'তবেই তো হয়েছে ! আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন,

সেই সময় আপনার বন্ধু আপনার ছাগল চুরি করেছে।' একথা শুনেই জোলা সব বুঝতে পারল। সে বলল, 'ঠিক ঠিক। সে বেটাই আমার হাঁড়িও চুরি করেছে, ছাগলও চুরি করেছে। এখন কী হবে?'

ভূতেরা তাকে একগাছি লাঠি দিয়ে বলল, 'এই লাঠি আপনার হাঁড়িও এনে দেবে, ছাগলও এনে দেবে। ওকে শুধু একটিবার আপনার বন্ধুর কাছে নিয়ে বলবেন, 'লাঠি লাগ তো!' তা হলে দেখবেন, কী মজা হবে। লাখ লোক ছুটে এলেও এ লাঠির সঙ্গে পারবে না; লাঠি তাদের সকলকে পিটে ঠিক করে দেবে।'

জোলা তখন সেই লাঠিটি বগলে করে তার বন্ধুকে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, একটা মজা দেখবে?'

বন্ধু তো ভেবেছে না জানি কী মজা হবে। তারপর যখন জোলা বলল, 'লাঠি, লাগ তো!' তখন সে এমনি মজা দেখল, যেমন তার জন্মে আর কখনো দেখেনি। লাঠি তাকে পিটে পিটে তার মাথা থেকে পা অবধি চামড়া তুলে ফেলল। সে ছুটে পালাল, লাঠি তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে পিটতে পিটতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে হাতজোড় করে বলল, 'তোর পায়ে পড়ি ভাই, তোর হাঁড়ি নে, তোর ছাগল নে, আমাকে ছেড়ে দে!'

জোলা বলল, 'আগে ছাগল আর হাঁড়ি আন, তবে তোকে ছাড়ব।'

কাজেই বন্ধুমশাই আর কী করেন? সেই পিটুনি খেতে খেতেই হাঁড়ি আর ছাগল এনে হাজির করলেন। জোলা হাঁড়ি হাতে নিয়ে বলল, 'সন্দেশ আসুক তো!' অমনি হাঁড়ি সন্দেশে ভরে গেল। ছাগলকে সুড়সুড়ি দিতে না দিতেই সে হো হো করে হেসে ফেলল, আর তার মুখ দিয়ে চারশ'টা মোহর বেরিয়ে পড়ল। তখন সে তার লাঠি, হাঁড়ি আর ছাগল নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এখন আর জোলা গরিব নেই, সে বড়মানুষ হয়ে গেছে। তার বাড়ি, তার গাড়ি, হাতি-ঘোড়া—খাওয়া পরা, চাল-চলন, লোকজন, সব রাজার মতন। দেশের রাজা তাকে যারপরনাই খাতির করেন, তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন ভারী কাজে হাত দেন না।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, আর কোন দেশের এক রাজা হাজার হাজার লোকজন নিয়ে এসে সেই দেশ লুটতে লাগল। রাজার সিপাইদের মেরে খোঁড়া করে দিয়েছে, এখন রাজার বাড়ি লুটে কখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি জোলাকে ডাকিয়ে বললেন, 'ভাই, এখন কী করি বল্ তো? বেঁধেই ও নেবে দেখছি।'

জোলা বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলেই সে তার লাঠিটা বগলে করে রাজার সিংহদরজার বাইরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। বিদেশী রাজা লুটতে লুটতে সেই দিকেই আসছে, তার সিপাই আর হাতী ঘোড়ার গোলমালে কানে তালা লাগছে, ধুলোয় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। জোলা খালি চেয়ে দেখছে, কিছু বলে না।

বিদেশী রাজা পাহাড়ের মতন এক হাতী চড়ে সকলের আগে আগে আসছে, আর ভাবছে, সব লুটে নেবে। আর, জোলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছে, আর একটু কাছে এলেই হয়।

তারপর তারা যেই কাছে এসেছে, অমনি জোলা তার লাঠিকে বলল, 'লাঠি, লাগ তো।' আর যাবে কোথায়? তখনি এক লাঠি লাখ লাখ হয়ে রাজা আর তার হাতী ঘোড়া সকলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আর পিটুনি যে কেমন দিল সে যারা সে পিটুনি খেয়েছিল তারাই বলতে পারে।

পিটুনি খেয়ে রাজা চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'আর না বাবা, আমাদের ঘাট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই।'

জোলা কিছু বলে না, খালি চুপ করে চেয়ে দেখছে আর একটু একটু হাসছে।

শেষে রাজা বলল, 'তোমাদের যা লুটেছি, সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার রাজ্য দিচ্ছি, দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও।'

তখন জোলা গিয়ে তার রাজাকে বলল, 'রাজামশাই, সব ফিরিয়ে দেবে বলছে আর তাদের রাজ্যও আপনাকে দেবে বলছে, আর বলছে দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও। এখন কী হুকুম হয়?'

রাজামশায়ের কথায় জোলা তার লাঠি থামিয়ে দিলে। তারপর বিদেশী রাজা কাঁদতে কাঁদতে এসে রাজামশাইয়ের পায়ে পড়ে মাপ চাইল।

রাজামশাই জোলাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার এই লোকটিকে যদি তোমার অর্ধেক রাজ্য দাও, আর তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তাহলে তোমাকে মাপ করব।'

সে তো তার সব রাজ্যই দিতে চেয়েছিল। কাজেই জোলাকে তার অর্ধেক রাজ্য আর মেয়ে দিতে তখনি রাজী হল।

তারপর জোলা সেই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল, আর রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আর ভোজের কি যেমন তেমন ঘটা হল! সে ভোজ খেয়ে যদি তারা শেষ করতে না পেরে থাকে তবে হয়তো এখনো খাচ্ছে। সেখানে একবার যেতে পারলে হত।

# টুনটুনি আর রাজার কথা

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিলো। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকুতে দিয়েছিলো ; সন্ধ্যার সময় তাঁর লোকেরা তার একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেলো।

টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এনে রেখে দিলে, আর ভাবলে, ইস্! আমি কতো বড়োলোক হয়ে গেছি! রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরেও সেই ধন আছে!

তারপর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে, আর বলে—

'রাজার ঘরে যে ধন আছে,
টুনির ঘরে সেই ধন আছে!'

রাজা তার সভায় বসে সে কথা শুনতে পেয়ে জিগ্যেস করলেন, 'হ্যা রে, পাখীটা কি বলছে রে?'

সকলে হাত জোড় করে বললে, 'মহারাজ! পাখী বলছে যে, আপনার ঘরে যে ধন আছে, ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে!'

শুনে রাজা খিল-খিল করে হেসে বললেন, 'দেখ তো, ওর বাসায় কি আছে?'

তারা দেখে এসে বললে, 'মহারাজ! দেখলাম ওর বাসায় একটি টাকা আছে!'

রাজা বললে, 'সে তো আমারই টাকা ; নিয়ে আয় সেটা।'

তখনি লোক গিয়ে টুনটুনির বাসা থেকে টাকাটি নিয়ে এলো। বেচারা আর কি করে, সে মনের দুঃখে বলতে লাগলো—

'রাজা বড়ো ধনে কাতর—
টুনির ধন নিলে বাড়ির ভিতর।'

শুনে রাজা আবার হেসে বললেন, 'পাখীটা তো বড়ো ঠ্যাটা রে! যা—ওর টাকা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

টাকাটা ফিরে পেয়ে টুনটুনির ভারি আনন্দ হয়েছে। তখন সে বলছে—

'রাজা ভারি ভয় পেলো—
টুনির টাকা ফিরিয়ে দিলো!'

রাজা জিগ্যেস করলেন, 'আবার কি বলছে, রে?'

সভার লোকেরা বললে, 'বলছে যে, মহারাজ নাকি বড্ড ভয় পেয়েছেন, তাই ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

শুনে তো রাজামশাই রেগে অস্থির। বললেন, 'কি? এতবড়ো কথা? আন তো ধরে, বেটাকে ভেজে খাই!'

যেই বলা, অমনি লোক গিয়ে টুনটুনি বেচারাকে ধরে আনলে। রাজা তাকে মুঠোয় করে নিয়ে বাড়ির ভিতরে গিয়ে রানীদের বললেন, 'এই পাখীটাকে ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে।'

বলে তো রাজা চলে এসেছেন, আর রানীরা সাতজনে মিলে সেই পাখীটাকে দেখছেন।

একজন বললেন, 'কি সুন্দর পাখী! আমার হাতে দাও তো, একবার দেখি।' বলে তিনি তাকে হাতে নিলেন। তা দেখে আবার আর একজন দেখতে চাইলেন। তাঁর হাত থেকে যখন আর একজন নিতে গেলেন তখন টুনটুনি ফস্কে উড়ে পালালো।

কি সর্বনাশ! এখন উপায় কি হবে? রাজা জানতে পারলে তো আর রক্ষে থাকবে না।

এমনি করে তারা দুঃখ করছেন, এমন সময় একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপ থপ করে যাচ্ছে। সাত রানী তাকে দেখতে পেয়েই খপ করে ধরে ফেললেন, আর বললেন, 'চুপ চুপ! কেউ যেন জানতে না

পারে। এইটেকে ভেজে দেবো, আর রাজামশাই খেয়ে ভাববেন, টুনটুনিই খেয়েছেন।'

সেই ব্যাঙটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে ভেজে রাজামশাইকে দিলে, তিনি খেয়ে ভারা খুশি হলেন ; তারপর সবে তিনি সভায় বসেছেন আর ভাবছেন, এবারে পাখীর বাচ্চাকে জব্দ করেছি।

অমনি টুনটুনি বলছে—

'বড়ো মজা, বড়ো মজা—
রাজা খেলেন ব্যাঙ-ভাজা!'

শুনেই তো রাজা মশাই লাফিয়ে উঠেছেন। তখন তিনি থুথু ফেলেন, ওয়াক্ তোলেন, মুখ ধোন আর কতো কী করলেন! তারপর রেগে বললেন, সাত রানীর নাক কেটে দাও।

অমনি জল্লাদ গিয়ে সাত রানীর নাক কেটে ফেললে। তা দেখে টুনটুনি বললে—

'এক টুনিতে টুনটুনালো,
সাত রানীর নাক কাটালো।'

তখন রাজা বললেন, 'আন তো রে, ব্যাটাকে ধরে। এবারে গিলে খাবো। দেখি, কেমন করে পালায়।'

টুনটুনিকে ধরে আনা হলো। রাজা বললেন, 'আন জল।'

জল এলো। রাজা মুখ ভরে জল নিয়ে, টুনটুনিকে মুখে পুরেই, চোখ বুজে ঢক করে গিলে ফেললেন। সবাই বললে, এবারে পাখী জব্দ!

বলতে বলতেই রাজামশাই 'ভোক' করে মস্ত একটা ঢেকুর তুললেন। সভার লোক চমকে উঠলো আর টুনটুনি সেই ঢেকুরের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে উড়ে পালালো।

রাজা বললেন, 'গেলো গেলো। ধরো ধরো।' অমনি দুশো লোক ছুটে গিয়ে আবার বেচারাকে ধরে আনলো। তারপর আবার জল

নিয়ে এলো, আর সিপাই এসে তলোয়ার নিয়ে রাজামশাইয়ের কাছে দাঁড়ালো—টুনটুনি বেরুলেই তাকে দু'টুকরো করে ফেলবে।

এবারে টুনটুনিকে গিলেই, রাজামশাই দু-হাতে মুখ চেপে বসে থাকলেন, যাতে টুনটুনি আর বেরুতে না পারে। সে বেচারা পেটের ভিতরে গিয়ে ভয়ানক ছটফট করতে লাগলো। খানিক বাদে রাজামশাই নাক সিটকে বললেন, 'ওয়াক, আর অমনি টুনটুনি সুদ্ধ তার পেটের ভিতরের সকল জিনিস বেরিয়ে এলো। সবাই বললে, 'সিপাই—সিপাই। মারো—মারো। পালালো।'

সিপাই তাতে থতমতো খেয়ে, তলোয়ার দিয়ে যেই টুনটুনিকে মারতে যাবে, অমনি সেই তলোয়ার টুনটুনির গায়ে না পড়ে, রাজামশায়ের নাকে গিয়ে পড়লো।

রাজামশাই ভয়ানক চ্যাঁচালেন, সঙ্গে সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগলো। তখন ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে বাঁচালেন। টুনটুনি তা দেখে বলতে লাগলো—

'নাক কাটা রাজা রে,
দেখো তো কেমন সাজা রে!'

বলেই সে উড়ে সে দেশ থেকে চলে গেলো। রাজার লোক ছুটে এসে দেখলো খালি বাসা পড়ে আছে।

# পাকা ফলার

পাড়াগাঁয়ে এক ফলারে-বামুন ছিল। তাহাকে যাহারা নিমন্ত্রণ করিত, তাহারা সকলেই খুব গরিব; দৈ-চিঁড়ের বেশি কিছু খাইতে দিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না।

ব্রাহ্মণ শুনিয়াছিল দৈ-চিঁড়ের ফলারের চাইতে পাকা ফলারটা ঢের ভাল। সুতরাং এর পর যে ফলারের নিমন্ত্রণ করিতে আসিল, তাহাকে সে বলিল যে, 'পাকা ফলার খাওয়াতে হবে।' সে বেচারা গরিব লোক, পাকা ফলার সে কোথা হইতে দিবে? তাই সে বিনয় করিয়া বলিল, 'মশাই, পাকা ফলার দেওয়া কি যার তার কাজ? রাজা-রাজড়া হলে তবে পাকা ফলার দিতে পারে।' এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, 'তবে, রাজা যেখানে থাকে, সেইখানে গিয়ে আমি পাকা ফলার খাব।'

ব্রাহ্মণ পাকা ফলার খাইবার জন্য রাজার বাড়ি চলিয়াছে। পথে যাহাকে দেখে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁগা, রাজার বাড়িটা কোন্ খানটায়?' একজন তাহাকে রাজার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, 'ঐ যে পাকা বাড়ি দেখছ, ঐটে রাজার বাড়ি।'

ব্রাহ্মণ 'পাকা ফলার' যেমন খাইয়াছে, 'পাকা বাড়ি'ও তেমনি দেখিয়াছে। সুতরাং 'পাকা বাড়ি'র কথা শুনিয়া সে ভারি আশ্চর্য হইয়া রাজার বাড়ির দিকে তাকাইল। সে দেশের সব লোকেরই কুঁড়েঘর; খালি রাজার একটি সুন্দর পাকা বাড়ি ছিল। রাজার বাড়ি দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখে লাল পড়িতে লাগিল। সে গদগদ স্বরে বলিল, 'পাকা বাড়ি! আহা! পাকা বাড়িই বটে! না হবে কেন? সে যে রাজা, তাই সে অমন বাড়িতে থাকে। ওটা তয়ের করতে না জানি কত ক্ষীর, ছানা আর চিনি লেগেছিল!'

এ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গিয়া রাজার বাড়ির একটা কোণ কামড়াইয়া ধরিল ; আবার তখনই 'উঃ-হুঃ-হুঃ' করিয়া কামড় ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল, 'তাই তো, এই পাকা ফলারের এত নাম! আর খানিক ভাবিয়া সে বলিল, 'ওঃ হো! বুঝেছি। নারকেলের মতন আর কি! ওটা ওর খোলা ; আসল জিনিসটা ভিতরে আছে।' এই বলিয়া সে আগের চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে কামড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার দুইটা দাঁত ভাঙিয়া গেল, তাহাতে গ্রাহ্য নাই। কামড়াইতে কামড়াইতে সে সেই কোণের অনেকখানি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, আর মনে করিতেছে যে, আর বেশি দেরি নেই ; এর পরই পাকা ফলার আসবে।' এমন সময় কোথা হইতে মস্ত পাগড়িওয়ালা এক দারোয়ান আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। 'আরে ঠাকুর, ক্যা করতে হো? মহারাজকে ইমারত খা ডাল্‌তে হো? চলো তুম হমারে সাথ।' এই বলিয়া দারোয়ান তাহাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

দারোয়ানের কাছে সকল কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'কি ঠাকুর, ওখানে কী করছিলে?' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল 'মহারাজ! আমি পাকা ফলার খাচ্ছিলুম। খোলাটা না ভাঙতে ভাঙতেই এই বেটা দারোয়ান আমাকে ধ'রে এনেছে!'

এই কথা শুনিয়া রাজা মহাশয় হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, আর বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, ঠাকুরের পেটে অনেক বুদ্ধি। যাহা হউক, তাহার সাদাসিধে কথাগুলি রাজার বেশ ভাল লাগিল। সুতরাং তিনি হুকুম দিলেন যে, এই ব্রাহ্মণকে পেট ভরিয়া পাকা ফলার খাইবার মত ময়দা, ঘি আর মিঠাই দাও।

ব্রাহ্মণ মনের সুখে রাজাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ময়দা, ঘি আর মিঠাই লইয়া ঘরে ফিরিল। আসিবার সময় বলিয়া আসিল

যে, পাকা ফলার খাইয়া আবার রাজামহাশয়কে আশীর্বাদ করিতে আসিবে।

পরদিন সকালে রাজা মহাশয়, মুখ হাত ধুইয়া সভায় আসিয়াই সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ঠাকুর, কাল পাকা ফলার খেলে কেমন?' ব্রাহ্মণ বলিল, 'মহারাজ, অতি চমৎকার খেয়েছি! পাকা ফলার কি আর মন্দ হতে পারে? গুঁড়োগুলো আগে গলায় বড্ড আটকাচ্ছিল। জল দিয়ে গুলে নিতে শেষে তরল হয়; কিন্তু অনেক খেতে না খেতেই বমি হয়ে গেল!'

ময়দা আর ঘি দিয়া যে লুচি তৈয়ার করিতে হয়, ব্রাহ্মণ বেচারা তাহা জানিত না। কাজেই সে ঐ কাঁচা ময়দাগুলিকেই ঘি আর মিঠাই দিয়া মাখিয়া খাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। সহজে তরল হয় না দেখিয়া, আবার তাহার সঙ্গে জল মিশাইয়াছে। খাইতে তাহার খুব ভালই লাগিয়াছিল; তবে, পেটে রহিল না, এই যা দুঃখ!

রাজা দেখিলেন, লুচি নিজে তয়ের করিয়া খাইতে হইলে আর ব্রাহ্মণের ভাগ্যে পাকা ফলার ঘটিতেছে না। সুতরাং তিনি তাঁহার রসুয়ে বামুনদের একজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এখান থেকে ময়দা ঘি নিয়ে তোমার বাড়িতে লুচি তয়ের ক'রে, এই ঠাকুরকে পেট ভ'রে পাকা ফলার খাইয়ে দাও।'

রসুয়ে বামুন ফলারে-বামুনকে তাহার বাড়ি দেখাইয়া বলিল যে, আমি খাবার তয়ের ক'রে রাখব, বিকালে আপনি এসে খাবেন! আমি বাড়ি থাকব না, আমার ছেলে আপনাকে খেতে দেবে এখন।' ব্রাহ্মণ রাজি হইয়া বাড়ি গিয়া বিকাল বেলার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগল।

রসুয়ে বামুনের সেই ছেলেটা ভাল লোক ছিল না; একটা চোরের সঙ্গে তাহার বন্ধুতা ছিল। রসুয়ে বামুন ফলারে-বামুনের

জন্য লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি তয়ের করিয়া তাহার ছেলেকে বলিল, 'সেই লোকটি এলে তাকে বেশ ক'রে খাওয়াস!' তাহার ছেলে বলিল, 'তার জন্যে কিছু চিন্তা করোনা, আমি তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াব এখন।' রসুয়ে বামুন রাজবাড়িতে চলিয়া গেল; আর তাহার ছেলে ফলারে-বামুনের খাবারের আয়োজনে মন দিল। দু'সেরের বেশি লুচি আর তাহার মত তরকারি মিঠাই ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। খানচারেক লুচি আর খানিকটা তরকারি ফলারে-বামুনের জন্য রাখিয়া, আর সমস্ত সেই হতভাগা তাহার সেই বন্ধু আর নিজের জন্য রাখিয়া দিল। ফলারে বামুন আসিলে পর সে সেই চারখানা লুচি তাহাকে খাইতে দিল। সে বেচারা জন্মেও লুচি খায় নাই, তাহাতে আবার এমন চমৎকার লুচি—রাজার বামুন ঠাকুর যাহা তয়ের করিয়াছে! এমন জিনিস দু-চারখানি মাত্র খাইয়া তাহার পেট তো ভরিলই না, বরং তাহার ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। সে খালি দুঃখ করিতে লাগিল, 'আহা! আর যদি খানকতক দিত!'

রসুয়ে বামুনের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ফলারে-বামুন রাস্তা দিয়া চলিল। তাহার মনের দুঃখ রাখিবার আর জায়গা দেখিতেছে না। চলে, আর খালি বলে, 'আহা! আর যদি খানকতক দিত!'

এমন সময় হইয়াছে কি, রাজার প্রধান ভাণ্ডারী সেই রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সে নিজের হাতে সেদিন সকাল বেলায় ঐ ফলারে-বামুনের জন্য পুরো দু সের ময়দা আর তাহার মতন অন্য সব জিনিস মাপিয়া দিয়াছে। ফলারে-বামুনের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ঠাকুরমশাই! কী যদি আর খানকতক দিত?' ফলারে-বামুন বলিল, 'বাবা, আমি পাকা ফলারের কথা বলছি। রাজামশাই চিরজীবী হউন, আমাকে এমন জিনিস খাইয়েছেন!' খালি যদি আর খানকতক হত।'

ভাণ্ডারী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাকে কখানা দিয়েছিল? 'ফলারে

বামুন বলিল, 'চারখানি পাকা ফলার আমাকে দিয়েছিল।' ভাণ্ডারী সবই বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'সে কি ঠাকুরমশাই! দু সের ময়দা দিয়েছি, তাতে কি মোটে চারখানা লুচি হয়?' ব্রাহ্মণ বলিল, 'হাঁ বাপু, চারখানাই ছিল। আর তাতে খুব চমৎকার লেগেছিল।' ভাণ্ডারী বলিল, 'দু সের ময়দায় তার চেয়ে ঢের বেশি লুচি হয়। আমার বোধ হচ্ছে, ঐ রসুয়ে বামুনের ছেলেটা বাকি লুচিগুলো মাচায় তুলে রেখেছে। আপনি আবার যান। এবারে গিয়ে একেবারে মাচায় উঠবেন; দেখবেন আপনার লুচি সেখানে আছে।' ব্রাহ্মণ বলিল, 'তাই নাকি? বাপু তুমি বেঁচে থাকো। হতভাগা, বেল্লিক, বাঁদর, শয়তান, পাজি'—বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ সেই রসুয়ে বামুনের বাড়ির পানে ছুটিল। গালিগুলি অবশ্য ভাণ্ডারীকে দেয় নাই—রসুয়ে বামুনের ছেলেকে দিয়াছিল।

রসুয়ে বামুনের ছেলে ফলারে বামুনকে চারিখানি লুচি খাওয়াইয়া বিদায় করিয়াই, তাহার সেই চোর বন্ধুর কাছে গিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে চোরকে বলিল, 'বন্ধু, ঢের লুচি তয়ের ক'রে মাচার উপর রেখে এসেছি। তুমি শিগগির যাও; আমিও এই বাজার থেকে একটা জিনিস নিয়ে এখনি আসছি।'

চোর রসুয়ে বামুনের মাচার উপর উঠিয়া সবে লুচির ঢাকনা খুলিতে যাইবে, এমন সময় ফলারে-বামুন আসিয়া উপস্থিত। এবারে কথাবার্তা নাই, একেবারে মাচায় গিয়া উঠিল। চোর মুশকিলে পড়িল। লুকাইবারও স্থান নাই, পলাইবারও পথ নাই। এখন সে যায় কোথায়? শেষটা আর কী করে, মাচার কোণে একটা কাঠের থাম জড়াইয়া কোন রকমে বেমালুম হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে আবার ফলারে-বামুন নিতান্তই সাদাসিধে লোক, লুচি খাইবার জন্য তাহার মনটা যারপরনাই ব্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং চোরকে সে দেখিতে পাইল না। ফলারে-বামুন

সামনে লুচি, সন্দেশ, তরকারি, মিঠাই সাজানো দেখিয়াই খাইতে বসিয়া গেল। পেটে যত ধরিল, তত সে খাইল ; আর একটি হজমি গুলির স্থানও নাই।

এমন সময় ভারি একটা মজা হইল। রসুয়ে বামুনের ছেলেও বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর ঠিক সেই সময় রসুয়ে বামুনও আসিয়াছে। অন্যদিন সে প্রায় দুপুর রাত্রের পূর্বে ফিরে না, কিন্তু সেদিন সে ভুলিয়া একটা ঝাঁজরা ফেলিয়া গিয়াছিল, সেটার ভারি দরকার। ছেলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, তুমি এখনি ফিরে এলে যে ?' রসুয়ে বামুন বলিল, 'ঝাঁজরা ফেলে গিয়েছিলুম, তাই নিতে এসেছি।'

এতক্ষণে ফলারে-বামুনের পেট এত বোঝাই হইয়াছে যে, আর একটু হইলেই তাহার দম আটকায়। পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে জল নাই। সে 'জল জল' বলিয়া চেঁচাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাল করিয়া কথা ফুটিল না।

রসুয়ে বামুন ছেলেকে বলিল, 'ওটা কী রে ?' ছেলে দেখিল ভারি মুশকিল। সে ফলারে-বামুনের কথা তো আর জানিত না, কাজেই সে মনে করিয়াছে যে ওটা তাহার বন্ধু, গলায় সন্দেশ আটকাইয়া বিশ্রী স্বরে জল চাহিতেছে। বন্ধুর খবরটা বাপকে দিলে সে আর বন্ধুর হাড় আস্ত রাখিবে না, আর কিছু না বলিলেও হয়তো এখনই মাচায় উঠিয়া দেখিবে। এমন সময় হঠাৎ তাহার বুদ্ধি যোগাইল—সে বলিল, 'বাবা, ওটা নিশ্চয় ভূত। তা নইলে মাচার থেকে অমন বিশ্রী আওয়াজ দেবে কেন !'

ভূতের কথা শুনিয়া রসুয়ে বামুন কাঁপিতে লাগিল। আরও মুশকিলের কথা এই যে ভূতটা জল চাহিতেছে। তাহার কাছে জল লইয়া যাইতে কিছুতেই ভরসা হইতেছে না, অথচ জল না পাইলে সে নিশ্চয় ভয়ানক চটিয়া যাইবে। তারপর সে কী করে তাহার ঠিক

কী ? ছেলের ভারি ইচ্ছা, সে ভূতকে জল দিয়া আসে। কিন্তু রসুয়ে বামুন বলিল, 'তা হবে না, যদি তোর ঘাড় ভেঙে দেয়।' এই সময়ে তাহার মনে হইল যে, মাচার উপর কয়েকটা নারকেল ছাড়ানো আছে, সুতরাং সে ভূতকে বলিল, 'মাচায় নারকেল আছে, থামে আছড়ে ভেঙে খাও ?'

ফলারে-বামুনের হাতের কাছেই নারকেলগুলি ছিল ; সে তাহার একটা হাতে লইয়া থামে আছড়াইয়া ভাঙিতে গেল। সে থাম জড়াইয়া চোর দাঁড়াইয়া ছিল ; ব্রাহ্মণ পিপাসার চোটে থাম মনে করিয়া সেই চোরের মাথাতেই নারকেল আছড়াইয়া বসিয়াছে—একেবারে মাথা ফাটাইয়া ফেলিবার যোগাড় আর কি !

এরপর একটা মস্ত গোলমাল হইল। নারকেলের বাড়ি খাইয়া চোর ভয়ানক চেঁচাইয়া উঠিল ; আর তাহাতে ভয়ানক চমকাইয়া গিয়া ব্রাহ্মণও হাঁউমাউ করিতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া পাড়ার সমস্ত লোক সেখানে আসিয়া জড়ো হইল। আসল কথাটা জানিতে এর পর আর বেশি দেরি হইল না। চোর ধরা পড়িল, আর রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে সেই ঝাঁজরা দিয়া এমনি ঠেঙান ঠেঙাইল যে কি বলিব !

# রাবণ

রাবণের কথা তোমরা সকলেই জান। রাবণের পিতার নাম বিশ্রবা, মাতার নাম কৈকসী। বিশ্রবা পরম ধার্মিক মুনি ছিলেন। রাবণ আর তাহার ভাইবোনেরা জন্মিবার পূর্বেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহাদের সকলের ছোটটি খুব ধার্মিক হইবে, আর সকলেই ভয়ঙ্কর দুষ্ট রাক্ষস হইবে।

মুনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর তাহাদের বোন সূর্পণখা,—ইহাদের এক একটা এমনি বিকট আর দুষ্ট রাক্ষস হইল, যে কি বলিব! ইহাদের ছোট ভাই বিভীষণও রাক্ষস ছিল বটে। কিন্তু যারপরনাই ভাল লোক ছিল।

রাবণের দশটা মাথা আর কুড়িটা হাত ছিল। দাঁতগুলো ছিল থামের মত বড় বড়, চুলগুলি আগুনের শিখার মত লাল, আর শরীরটা কালো পর্বতের মত বিশাল। তাহার জন্মের সময় পৃথিবী কাঁপিয়াছিল, সূর্য কয়লা হইয়া গিয়াছিল, আর সমুদ্রের জল তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছিল। দশটা মাথা দেখিয়া তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'দশগ্রীব'। উহাই উহার আসল নাম, 'রাবণ' নাম পরে হইয়াছিল।

ছেলেবেলায় রাবণ ভাইদিগকে লইয়া দশ হাজার বৎসর ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিল। এই দশ হাজার বৎসর সে আহার করে নাই। এক এক হাজার বৎসর যাইত, আর নিজের এক একটি মাথা কাটিয়া সে আগুনে আহুতি দিত। নয় হাজার বৎসরে নয়টি মাথা সে এইরূপ করিয়া আগুনে দিল। তারপর দশ হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে, যেই সে তাহার বাকি একটি মাথাও কাটিতে যাইবে, অমনি

ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, 'দশগ্রীব! আমি খুশী হইয়াছি, এখন তুমি বর লও!'

দশগ্রীব বলিল 'আমাকে অমর করিয়া দিন।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'সেটি হইবে না। অন্য বর লও।' দশগ্রীব বলিল, 'তবে এই বর দিন যে, দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, পক্ষী—ইহাদের কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হইবে। তাহা ছাড়া তোমার যে মাথাগুলি কাটিয়া দিয়াছ, তাহা ফিরিয়া পাইবে; ইহার উপর আবার যখন যেরূপ তোমার ইচ্ছা হয়, তেমনি চেহারা করিতে পারিবে।'

কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণও এই দশ হাজার বৎসর ধরিয়া খুব তপস্যা করিয়াছিল, সুতরাং ব্রহ্মা তাহাদিগকেও বর দিতে গেলেন। বিভীষণ বলিল 'আমাকে দয়া করিয়া এই বর দিন, যেন আমার ধর্মে মতি থাকে।' এ কথায় ব্রহ্মা অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাহাকে সে বর ত দিলেনই, তাহা ছাড়া তাহাকে অমর করিয়া দিলেন।

কুম্ভকর্ণকে বর দিবার সময় দেবতারা ব্রহ্মাকে বলিলেন, 'প্রভু, এমন কাজ করিবেন না; এ বেটা বর পাইলে আমাদের সকলকে খাইয়া ফেলিবে। এর মধ্যেই কতজনকে ধরিয়া খাইয়াছে।'

তাই ত! এখন তবে কি করা যায়? তপস্যা করিয়াছে, কাজেই বর দিতেই হইবে; আবার বর দিলেও বিপদের কথা। তখন ব্রহ্মা বুদ্ধি করিয়া সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের মুখের ভিতরে ঢুকাইয়া দিলেন। সরস্বতী ঢুকিতেই তাহার মাথায় কি যে গোল লাগিয়া গেল, আর বেচারা ঠিক করিয়া কথা কহিতে পারিল না। ব্রহ্মা বলিলেন, 'কুম্ভকর্ণ! কি চাহ?' কুম্ভকর্ণ বলিল, 'আমি খালি ঘুমাইতে চাই! ছয় মাস ঘুমাইয়া একদিন উঠিয়া খাইব!' ব্রহ্মা বলিলেন 'বেশ কথা! তাই হোক!' এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবতা-দিগকে লইয়া চলিয়া গেলেন, আর কুম্ভকর্ণ মাথা চুলকাইতে

চুলকাইতে ভাবিল, 'তাই ত! এটা কি বলিলাম? দেবতা বেটারা আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল নাকি?'

যা হোক, আমরা দশগ্রীবের কথা বলিতেছি? সে ত বর পাইয়া নিতান্তই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, এখন আর কেহ তাহার কোন কথায় 'না' বলিতে ভরসা পায় না। দশগ্রীবের এক দাদা ছিলেন তাহার নাম কুবের। তিনিও বিশ্রবা মুনির পুত্র, তাঁহার মাতা ভরদ্বাজ মুনির কন্যা দেববর্ণিনী। কুবের লঙ্কায় বাস করিতেন। দশগ্রীব তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, 'দাদা! লঙ্কাপুরীখানি আমাকে ছাড়িয়া দাও!'

কাজেই তখন কুবের আর কি করেন? ভালয় ভালয় না দিলে জোর করিয়া কাড়িয়া নিবে। তাহার চেয়ে তিনি কৈলাস পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। দশগ্রীবও তখন পরম আনন্দে রাক্ষসের দলসমেত লঙ্কায় আসিয়া রাজা হইয়া বসিল।

ইহার কিছুদিন পরেই দশগ্রীব বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের সহিত সূর্পণখার বিবাহ দিল। তাহাদের তিন ভাইয়ের বিবাহ হইতেও আর বেশী বিলম্ব হইল না। কিন্তু হায়, শুভকার্য শেষ হইতে না হইতেই ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঘোর নিদ্রা আসিয়া কুম্ভকর্ণকে ধরিয়া বসিল। তাহার চোখ বুজিয়া আসিল, মাথা ঢুলিয়া পড়িল। সে বিকট মুখে ভীষণ হাই তুলিয়া বলিল, 'দাদা! বড়ই ঘুম পাইয়াছে, আমার শয়নের জন্য ঘর করিয়া দাও।' তখনই রাবণের হুকুমে চমৎকার ঘর প্রস্তুত হইল। তাহার ভিতরে গিয়া সেই যে কুম্ভকর্ণ শুইল, হাজার হাজার বৎসরেও আর উঠিল না।

এদিকে দশগ্রীবের জ্বালায় ত্রিভুবন অস্থির! সে দেবতা, গন্ধর্ব, মুনি-ঋষি, কাহাকেও মানে না। এক ধার হইতে সকলকে মারিয়া তাহাদের বাড়ি, ঘর, বাগান সব চুরমার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুবের ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে বারণ করিবার জন্য দূত

পাঠাইলেন। সে দূতের কথা দশগ্রীব ত শুনিলই না; লাভের মধ্যে বেচারাকে কাটিয়া রাক্ষসদিগকে খাইতে দিল। তারপর রথে চড়িয়া এই বলিয়া সে বাহির হইল যে, 'আমি ত্রিভুবন জয় করিব !'

বাহির হইয়াই সে সকলের আগে গিয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হইল—তাঁহার উপরেই রাগটা বেশী। কুবেরের যক্ষেরা অনেক যুদ্ধ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না। দশগ্রীবের সঙ্গে ভীষণ রাক্ষসেরা গিয়াছিল; তাহারা যক্ষদের এমনি দুর্গতি করিল যে তাহা আর বলিবার নহে। যক্ষেরা সোজাসুজি সরলভাবে যুদ্ধ করে, আর রাক্ষসেরা নানা রকম ফাঁকি দেয়; কাজেই যক্ষেরা হারিয়া গেল। কুবের নিজে আসিয়াও বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। দশগ্রীব তাঁহাকে অস্ত্রের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া তাঁহার 'পুষ্পক' নামক রথখানি লইয়া চলিয়া গেল। সে রথ বড়ই আশ্চর্য ছিল। তাহাতে সঙ্গে দানা, পানি, সইস, কোচমান কিছুরই দরকার হইত না; যেখানে যাইবার হুকুম পাইত, অমনি সে উড়িয়া গিয়া সেখানে হাজির হইত।

সেই পুষ্পক রথে চড়িয়া দশগ্রীব স্বর্গের বিশাল শরবনে গিয়া উপস্থিত হইল। পর্বতের উপরে সে অতি পবিত্র বন, কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থান, তাহার উপর দিয়া কোন রথেরই যাইবার হুকুম নাই! বিশেষতঃ শিব আর পার্বতী তখন সেখানে ছিলেন। কাজে কাজেই পুষ্পক রথ সেখানে গিয়া আটকাইয়া গেল। ইহাতে দশগ্রীব যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছে; এমন সময় শিবের দূত নন্দী আসিয়া তাহাকে বলিল যে, 'দশগ্রীব, মহাদেব এখানে আছেন, তুমি ফিরিয়া যাও।'

নন্দীর চেহারা বড়ই অদ্ভুত ছিল। ছোট্ট খাট্টো পিঙ্গলবর্ণ লোকটি, হাত দুখানি বানরের মত। দশগ্রীব তাহার কথা শুনিবে কি, সে

হাসিয়াই অস্থির। কিন্তু নন্দী ছাড়িবার পাত্র নহে। সে ছোট হইলেও দেখিতে বড়ই ষণ্ডা, তাহাতে আবার হাতে ভয়ঙ্কর শূল। দশগ্রীব রাগের ভরে রথ হইতে নামিয়া সবে বলিয়াছিল, 'কে রে তোর মহাদেব?' অমনি নন্দী তাহাকে দুই ধমক লাগাইয়া দিল। তখন সে ভারী চটিয়া বলিল, 'বটে! আমাকে যাইতে দিবি না? আচ্ছা। দাঁড়া! তোদের পাহাড় আমি তুলিয়া নিব!'

এই বলিয়া সত্য সত্যই সে কুড়ি হাতে সেই পর্বতের তলা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সে কি যেমন তেমন টান? টানের চোটে পর্বত নড়িয়া উঠিল, শিবের ভূতগুলি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, পার্বতী যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। মহাদেব কিন্তু কিছু মাত্র ব্যস্ত হইলেন না। তিনি কেবল পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি দিয়া পর্বতখানিকে একটু চাপিয়া ধরিলেন, তাহাতে সে তাহার জায়গায় বসিয়া গেল, আর অমনি, দরজার কামড়ে দুষ্টু খোকার আঙ্গুল আটকাইবার মতন, দশগ্রীব মহাশয়ের হাত কখানিও পর্বতের চাপনে আটকাইয়া গেল।

তখন ত দশগ্রীব দশমুখে ভ্যা ভ্যা শব্দে চ্যাচাইয়া অস্থির! চীৎকারে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল, সাগর উছলিয়া উঠিল। দেবতারা ছুটিয়া পথে বাহির হইলেন।

হাজার বৎসর ধরিয়া দশগ্রীব ঐরূপ চ্যাচাইয়াছিল, আর মহাদেবকে ক্রমাগত মিনতি করিয়াছিল। মহাদেবের দয়ার কথা সকলেই জানে, তাহার কষ্ট দেখিয়া তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে ছাড়িয়া ত দিলেনই, তাহার উপর আবার ভারী ভারী কয়েকটা অস্ত্রও তাহাকে দিয়া দিলেন, আর বলিলেন, 'দশগ্রীব, তুমি চমৎকার চ্যাচাইয়াছিলে, তোমার চীৎকারে সকলেই ভয় পাইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তোমার নাম 'রাবণ' ( যে চীৎকারে লোকের ভয় লাগাইয়া দেয় ) হইল।'

দশগ্রীব দেখিল, পাহাড় চাপা পড়িয়া মোটের উপর তাহার লাভই হইয়াছে। কাজেই সে খুব খুশী হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

দশগ্রীব শিবের নিকট বর পাইয়া 'রাবণ' হইল, অস্ত্রশস্ত্রও অনেকগুলি পাইল। তখন হইতে সে ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, আর রাজ রাজড়া যাহাকে সামনে পায় তাহাকেই বলে, 'হয় যুদ্ধ কর, না হয় হার মান!'

উষীরবীজ নামে একটা জায়গায় মরুত্ত নামে এক রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, রাবণ পুষ্পক রথে চড়িয়া হেইয়ো হেইয়ো শব্দে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞের স্থানে দেবতাদের অনেকেই ছিলেন, রাবণকে দেখিয়াই ভয়ে তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। ছুটিয়া যে পলাইবেন, এতটুকু ভরসাও তাঁহাদের হইল না,—কি জানি, পাছে ধরিয়া ফেলে। তাই তাঁহারা সেইখানেই নানা জন্তুর বেশ ধরিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ইন্দ্র হইলেন ময়ূর, ধর্ম হইলেন কাক, কুবের হইলেন গিরগিটি, বরুণ হইলেন হাঁস।

এদিকে মরুত্তের সঙ্গে রাবণের খুবই যুদ্ধ বাধিবার যোগাড় দেখা যাইতেছে, গালাগালি আরম্ভ হইয়াছে, মারামারিরও বিলম্ব নাই; এমন সময় মরুত্তের গুরু সম্বল মুনি তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ! যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, কেন না তাহা হইলে তোমার যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাতে সর্বনাশ হইবে।' কাজেই মরুত্ত চুপ করিয়া গেলেন, আর রাবণ 'জিতিয়াছি! জিতিয়াছি!' বলিয়া খুবই বাহাদুরি করিতে লাগিল। তারপর, সেখানে যত মুনি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে খাইয়া যারপরনাই খুশী হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তখন দেবতা মহাশয়েরা আবার যার যার বেশ ধরিয়া মনে করিলেন, 'বাবা! বড্ড বাঁচিয়া গিয়াছি।' যে সকল জন্তুর সাজ



তাঁহারা নিয়াছিলেন, তাহাদের উপরে অবশ্য তাঁহারা খুবই খুশী হইলেন, আর তাহাদিগকে বর দিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র ময়ূরকে বলিলেন, 'তোমার সাপের ভয় থাকিবে না, আর আমার যেমন হাজার চোখ, তোমার লেজেও তেমনি হাজার চোখ হইবে।' ময়ূরের লেজে আগে শুধুই নীলবর্ণ ছিল, তখন হইতে তাহাতে চমৎকার চক্র দেখা দিল।

ধর্ম কাককে বলিলেন, 'তোমার আর কোন অসুখ হইবে না। মরণের ভয়ও তোমার দূর হইল; কেবল মানুষে যদি মারে তবেই তোমার মৃত্যু হইবে।'

বরুণ হাঁসকে বলিলেন, 'তোমার গায়ের রং ধবধবে শাদা হইবে।' তখন হইতে হাঁস শাদা হইয়াছে, আগে তাহার আগাগোড়া শাদা ছিল না, পাখার আগা নীল, আর কোলের দিক ছেয়ে রঙের ছিল।

কুবের গিরগিটিকে বলিলেন, 'তোমার মাথা সোনার মত হইবে।' সেই হইতে গিরগিটির মাথায় সোনালী রং।

এদিকে রাবণের আর গর্বের সীমাই নাই, দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা প্রভৃতি বড় বড় রাজারা তাহার নিকট হার মানিয়া গেলেন, অন্যের ত কথাই নাই। কিন্তু অযোধ্যার রাজা অনরণ্য কিছুতেই তাহার নিকট হার মানিতে রাজী হইলেন না। তিনি আগেই অনেক সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাবণ তাঁহার রাজ্যে আসবামাত্র সেই সকল সৈন্য লইয়া তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হায়! তাঁহার সে সৈন্য রাবণের হাতে দু দণ্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল, নিজেও রাবণের হাতে ভয়ানক আঘাত পাইয়া রথ হইতে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রাবণ তখন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'কি? আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখন কেমন হইল?' অনরণ্য বলিলেন, 'মরিতে ত একদিন সকলকেই

হয়, কিন্তু আমি তোমার কাছে হটি নাই, যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতেছি, আর, আমি একথা তোমাকে বলিতেছি যে, আমাদের এই বংশে দশরথের পুত্র রামের জন্ম হইবে, সেই রামের হাতে তুমি তোমার উচিত সাজা পাইবে।'

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতেই দেবতারা তাঁহার উপরে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাজাও দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

একবার রাবণ মানুষ তাড়াইয়া ফিরিতে ফিরিতে দেখিল যে মেঘের উপর দিয়া নারদ মুনি হরিনাম গান করিতে করিতে আসিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, 'কি ঠাকুর মহাশয়! মঙ্গল ত? কি জন্য আসিয়াছেন?'

নারদ বলিলেন, 'আসিয়াছি যে বাপু, একটা কথা আছে। এই সব মানুষ যখন মৃত্যুর বশ, তখন এরা ত মরিয়াই রহিয়াছে; ইহাদিগকে মারিবার জন্য তুমি আবার এত পরিশ্রম কেন করিতেছ? ইহারা আপনা আপনিই একদিন যমের বাড়ি যাইবে। বাস্তবিক, যমই যত নষ্টের গোড়া। অতএব সেই বেটাকে যদি জব্দ করিতে পার, তবে সকলকেই জয় করা হইবে।'

রাবণ বলিল, "বড় ভাল কথা বলিয়াছেন ঠাকুর মহাশয়, আমি এখনি যাইতেছি।' বলিয়াই আর এক মুহূর্ত দেরী নাই,—অমনি রাবণ যমপুরীর পথ ধরিয়াছে! তখন নারদ ভাবিলেন, 'এবারে মজাটা হইবে ভাল! যাই, একবার দেখিয়া আসি।'

নারদ রাবণের আগেই গিয়া যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। যম বিচারাসনে বসিয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া সকলের পাপপুণ্যের বিচার করিতেছিলেন, নারদকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া নমস্কারপূর্বক বলিলেন, 'মুনি ঠাকুরের আজ কি চাই?'

নারদ বলিলেন, 'সাবধান হও বাছা, রাবণ তোমাকে জয় করিতে

আসিতেছে। মুস্কিল হইতে আটক নাই, কিন্তু বেটা বড় বেখাপ্পা লোক!’

বলিতে বলিতেই রাবণের ঝক্ঝকে পুষ্পক রথও আসিয়া দেখা দিল। রথ হইতে নামিয়াই সে দেখিল, যে নরকের কুণ্ডে দলে দলে পাপী সকল যমদূতগণের তাড়নায় চীৎকার করিতেছে। অমনি আর কথাবার্তা নাই।—সে যমদূতগুলিকে বিধিমতে ঠ্যাঙ্গাইয়া সকল পাপীকে ছাড়িয়া দিল! সে বেচারারা হঠাৎ ছাড়া পাইয়া যে কি আশ্চর্য আর খুশী হইল, তাহা আর বলিবার নয়। তখন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে বড়ই ভয়ঙ্কর। যমপুরীতে অসংখ্য সিপাহী সান্ত্রী থাকে, তাহাদের এক একজন ভয়ানক যোদ্ধা। তাহারা রাবণ আর তাহার লোকদিগকে মারিয়া রক্তারক্তি করিয়া দিল। মার খাইয়াও কিন্তু রাবণ যুদ্ধ করিতে ছাড়ে না। শূল শক্তি প্রাস গদা গাছ পাথর কত সে ছুঁড়িল, তাহার লেখা জোখা নাই। তখন যমের লোকেরা আর রাক্ষসকে ছাড়িয়া কেবল রাবণের উপরেই এমন ভয়ানক অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তাহাতে পুষ্পক রথ অবধি ডুবিয়া গিয়া রাবণের দম আটকিয়া মরিবার গতিক। দুর্দশার এক শেষ; রক্ত ধারায় দেহ ভাসিয়া গেল; কবচ কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তখন কাজেই তাহাকে রথ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।

এতক্ষণে আর রাবণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এবারে একটু বেগতিক, একটা বড় রকমের অস্ত্র না ছাড়িতে পারিলে আর চলিতেছে না। কাজেই সে তখন ধনুকে পাশুপত অস্ত্র যুড়িয়া যমের লোকদিগকে বলিল, ‘দাঁড়া বেটারা! এবারে তোদের দেখাইতেছি!’ এই বলিয়া সে সেই অস্ত্র ছুঁড়িবামাত্রই, তাহার তেজে যমের সকল সিপাহি ভস্ম হইয়া গেল। তখন রাবণের আর রাক্ষসগণের সিংহনাদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে আর কি!

সেই সিংহনাদ শুনিয়াই যম বুঝিতে পারিলেন যে, রাক্ষসদিগের

জয় হইয়াছে। তখন কাজেই সে রথে চড়িয়া তাঁহাকে স্বয়ংই বাহির হইতে হইল। সে যে কি ভয়ঙ্কর রথ, সে কথা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারিব না! তাহার উপর আবার স্বয়ং মৃত্যু প্রাস আর মুদ্গর লইয়া ভীষণবেশে যমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কালদণ্ড প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে।

সেই রথ আর তাহার ভিতর মৃত্যুকে দেখিয়াই রাবণের লোকেরা 'বাপরে! আমাদের যুদ্ধে কাজ নাই!' বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিল। কিন্তু রাবণ তাহাতে ভয় না পাইয়া, যমের সঙ্গে খুবই যুদ্ধ করিতে লাগিল। অস্ত্রের ভয় ত তাহার নাই, কারণ, সে জানে যে ব্রহ্মার বরের জোরে সে মরিবে না। কাজেই অনেক খোঁচা যেমন খাইল, খোঁচা দিলও ততোধিক। খোঁচা খাইয়া যম রাগে অস্থির হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তখন মৃত্যু যমকে বলিল, 'আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এখনি এই দুষ্টকে মারিয়া দিতেছি। আমি ভাল করিয়া তাকাইলে আর ইহাকে এক মুহূর্তও বাঁচিতে হইবে না।' যম বলিলেন, 'দেখ না, আমি ইহাকে কি সাজা দিই।' এই বলিয়াই তিনি রাগে দুই চোখ লাল করিয়া তাঁহার সেই ভীষণ 'কালদণ্ড' হাতে নিলেন। সে দণ্ড যাহার উপর পড়ে তাহার আর রক্ষা থাকে না।

যমকে কালদণ্ড তুলিতে দেখিয়া ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল, কে কোন্ দিক দিয়া পালাইবে তাহার ঠিক নাই, দেবতাদের অবধি বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। তখন ব্রহ্মা নিতান্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া যমকে বলিলেন, 'সর্বনাশ! কর কি? এই কালদণ্ড তুমি ছুঁড়িলেই যে আমার কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে। কালদণ্ডও আমিই গড়িয়াছি, রাবণকেও আমিই বর দিয়াছি। আমিই বলিয়াছি যে কালদণ্ড কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না। আবার আমিই বলিয়াছি যে রাবণ কোন দেবতার হাতে মরিবে না। এখন এই অস্ত্রে যদি রাবণ

মরে, তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়। লক্ষ্মীটি! আমার মান রাখ, এ অস্ত্র তুমি ছুঁড়িয়ো না।'

কাজেই যম তখন আর কি করেন? তিনি বলিলেন, 'আপনি হইতেছেন আমাদের প্রভু। সুতরাং আপনার হুকুম মানিতেই হইবে। কিন্তু, যদি এ দুষ্টকে মারিতেই না পারিলাম, তবে আর আমার এখানে থাকিয়াই কি ফল?' এই বলিয়া যম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; তাহা দেখিয়া রাবণ হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল, 'দুয়ো! দুয়ো! হারিয়া গেলি! হারিয়া গেলি!!' ততক্ষণে অন্য রাক্ষসদেরও খুবই সাহস হইয়াছে। আর তাহারা আসিয়া 'জয় রাবণের জয়!' বলিয়া আকাশ ফাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ব্রহ্মার কথায় যম যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলেন, রাবণ ভাবিল, সেটি তাহার নিজেরই বাহাদুরি। তখন আর তাহার গর্বের সীমাই রহিল না। সে বাছিয়া বাছিয়া বড় বড় যোদ্ধাদের সহিত বিবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বরুণের পুত্রগণ তাহার নিকট হারিয়া গেলেন, বরুণ নিজে ব্রহ্মার বাড়িতে গান শুনিতে যাওয়ায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার মান বাঁচিল। সূর্য যুদ্ধ না করিয়াই বলিলেন, 'আমি হার মানিতেছি!' রাবণের ভগ্নীপতি বিদ্যুৎজ্জিহ্ব বেচারাও তাহার হাতে মারা গেল।

কিন্তু সকল জায়গায়ই যে রাবণ বাহাদুরি পাইয়াছিল তাহা নহে। বলির বাড়িতে গিয়া সে অনেক বড়াই করিয়াছিল। বলি তাহাকে ধরিয়া নিজের কোলে বসাইয়া বলিলেন, 'কি চাও বাপু?' রাবণ বলিল, 'শুনিয়াছি বিষ্ণু নাকি আপনাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে ছাড়াইয়া দিতে পারি!'

একথা শুনিয়া বলির ভারী হাসি পাইল। তারপর তিনি কথায় কথায় তাহাকে বলিলেন 'ঐ যে ঝক্‌ঝকে চাকাটি দেখিতেছ ওটি

আমার কাঁছে লইয়া আইস ত।' এ কথায় রাবণ নিতান্ত অবহেলার সহিত গিয়া সেই জিনিসটা উঠাইল, কিন্তু কিছুতেই সেটাকে লইয়া আসিতে পারিল না। সে লজ্জিত হইয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

খানিক পরে রাবণের জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তখন আর লজ্জায় বেচারা মাথা তুলিতে পারে না। তখন বলি তাহাঁকে বলিলেন, 'এই চাকাটি আমার পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল!'

আর একবার রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া একটি দ্বীপে আগুনের মত তেজস্বী এক ভয়ঙ্কর পুরুষকে দেখিল। তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণ বলিল, 'যুদ্ধ দাও!' তারপর সে তাঁহাকে কত শূল, কত শক্তি, কত ঋষ্টি কত পট্টিশের ঘা মারিল, কিন্তু তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না। তখন সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ রাবণকে টিকটিকির মতন ধরিয়া দু'হাতে এমনি চাপিয়া দিলেন যে তাহাতেই তাহার প্রাণ যায় যায়। তারপর তিনি তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন।

কিঞ্চিৎ পরে রাবণ উঠিয়া রাক্ষসদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সেই ভয়ঙ্কর লোকটা কোথায় গেল?' রাক্ষসেরা একটা গর্ত দেখাইয়া বলিল, 'সে ইহারই ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে।' অমনি রাবণ তাড়াতাড়ি সেই গর্তের ভিতর ঢুকিল। তারপর পাতালের মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে এক জায়গায় গিয়া দেখিল সেই মহাপুরুষ একটা খাটের উপর ঘুমাইয়া আছেন; সেখানে গিয়া রাবণ সবে দুষ্ট ফন্দি আঁটিতেছে, এমন সময় সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, আর তাহাতেই রাবণ কানে তালা লাগিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল! তখন ভয়ঙ্কর পুরুষ তাহাকে বলিলেন, 'আর কেন? এই বেলা চলিয়া যাও। ব্রহ্মা তোমাকে অমর হইবার বর দিয়াছেন। কাজেই তোমাকে বধ করা হইল না।' সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ ছিলেন ভগবান কপিল।

আর একবার রাবণ গিয়াছিল মাহিষ্মতীর রাজা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে। মাহিষ্মতীতে গিয়া সে অর্জুনের মন্ত্রীদিগকে বলিল, 'তোমাদের রাজা কোথায়? আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব!' মন্ত্রীরা বলিলেন, 'তিনি বাড়িতে নাই।'

এ কথায় রাবণ সেখান হইতে বিন্ধ্য পর্বতে চলিয়া আসিল। বিন্ধ্য অতি সুন্দর পর্বত। সেই পর্বতের নীচ দিয়া নর্মদা নদী বহিতেছে, তাহার শোভা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এমন নির্মল জল, এমন শীতল বায়ু, এত রকমের ফুল আর অতি অল্প স্থানেই আছে। রাবণ মনের সুখে সে জলে নামিয়া স্নান করিল।

ঠিক সেই সময়ে সেখানে একটা ভারী আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছিল। নর্মদার জল স্বভাবতই পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে বহিয়া থাকে, কিন্তু সেদিন দেখা গেল যে তাহা এক একবার হঠাৎ উঁচু হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাতে রাবণ যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া শুক সারণকে বলিল, 'দেখ ত ব্যাপারটা কি।'

শুক সারণ তখনই পশ্চিমদিকে চলিয়া গেল, আর খানিক পরেই ব্যস্ত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, প্রকাণ্ড শাল গাছের মত উঁচু একটা লোক নর্মদায় নামিয়া স্নান করিতেছে। উহার এক হাজারটা হাত। সেই হাজার হাতে সে এক একবার নদীর জল আগলাইয়া ঠেলিয়া দিতেছে, আর তাহাতেই সে জল এত উঁচু হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

একথা শুনিয়াই রাবণ বলিয়া উঠিল,—'অর্জুন!' তারপর আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া অমনি গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। অর্জুনের লোকেরা তাহাকে আটকাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসেরা তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া গিলিয়া খাইয়া নাকাল করিয়াছিল।

অর্জুন একথা শুনিতে পাইয়াই বিশাল গদা হাতে ছুটিয়া

আসিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু সেই গদার সম্মুখে তাহারা কিছুতেই টিকিতে না পারিয়া শেষে ছুটিয়া পলাইল। তখন রাবণ আর অর্জুনের যে যুদ্ধ হইল, সে বড়ই ভয়ানক, দুজনেরই যেমন বিশাল দেহ হাতে তেমনি ভীষণ গদা। রাবণ ভয়ানক তেজের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে অর্জুনের গদার ঘায়ে অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। অর্জুনও অমনি তাহাকে ধরিয়া এমনি বাঁধন বাঁধিলেন যে সে কথা আর বলিবার নয়। তাহা দেখিয়া দেবতাগণের কি আনন্দই হইল। তাঁহারা যে যত পারিলেন, অর্জুনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

এদিকে রাক্ষসেরা আসিয়া অর্জুনের হাত হইতে রাবণকে ছাড়াইয়া নিতে কত চেষ্টাই করিল। কিন্তু সে কি তাহাদের কাজ? অর্জুন তাহাদিগকে বিধিমতে ঠেঙ্গাইয়া, রাবণকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

এখন রাবণের আর সঙ্কটের সীমাই নাই, এ সঙ্কট হইতে তাহাকে কে বাঁচায়? বাঁচাইবার লোক একটি মাত্র আছেন, তিনি হইতেছেন উহার পিতামহ পুলস্ত্য মুনি। মুনি ঠাকুর আসিয়া অর্জুনকে বলিলেন, 'বাছা, আমার নাতিটিকে ছাড়িয়া দাও। উহাকে যে সাজা দিয়াছ, তাহাতেই তোমার খুব নাম হইবে, আর উহাকে রাখিয়া লাভ কি?'

এ কথায় অর্জুন খুশী হইয়া তখনই রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন; সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া চোরের মত সেখান-হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু দুষ্ট লোকের লজ্জা আর কতকাল থাকে? দুদিন পরেই দেখা গেল যে, রাবণ আবার রাজাদিগকে খোঁচাইয়া ফিরিতেছে।

মুনির কথায় অর্জুন রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন, আবার তাহার সহিত বন্ধুতাও করিলেন। কাজেই তখন তাহার দর্পের সীমাই

রহিল না। যে কোন বীরের নাম শুনিলেই সে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া উপস্থিত হয় আর তর্জন গর্জন করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়। এমনি করিয়া একদিন সে কিষ্কিন্ধায় গিয়া বড়ই তর্জন গর্জন করিতে লাগিল—'বালী কোথায়? আমি যুদ্ধ করিব!'

বালী তখন বাড়ি ছিলেন না, সমুদ্রের ধারে সন্ধ্যা করিতে গিয়াছিলেন। অন্য বানরেরা রাবণকে বলিল, 'বালী সন্ধ্যা করিতে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন। ততক্ষণ তুমি এই বিচিত্র সংসার খানি একবার শেষ দেখা দেখিয়া লও; কারণ বালী আসিলে তোমার প্রাণের আশা তিল মাত্রও থাকিবে না। আর, যদি তোমার নিতান্তই শীঘ্র শীঘ্র মরিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে না হয় দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া লও।'

রাবণ তখনই বানরদিগকে বকিতে বকিতে পুষ্পক রথ হাঁকাইয়া চলিয়া গেল, আর খানিক দূর গিয়াই দেখিল, বালী সোনার পাহাড়ের ন্যায় সমুদ্রের ধারে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখখানি সকালবেলার সূর্যের মত লাল আর উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। রাবণ ভাবিল, 'চুপি চুপি গিয়া বানরকে হঠাৎ জাপটিয়া ধরিতে হইবে!' এই বলিয়া সে খুবই চুপি চুপি যাইতে লাগিল; সে জানে না যে, বালী ইহার আগেই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন। আর তাহার মনের কথাটি ঠিক বুঝিয়া লইয়া তাহারই জন্য চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—একটিবার হাতের কাছে পাইলেই তামাশাটা দেখাইয়া দিবেন।

চোখে ভ্রূকুটি, মুখে খামাচি, হাত দুটি বিষম ব্যগ্রভাবে বাড়ান, এমনি ভাবে আসিয়া রাবণ চোরের মত বালীর পিছনে দাঁড়াইল; ভাবিল! 'এইবার ধরি!' কিন্তু হায়, তাহার আগেই বালী তাহাকে ধরিয়া বগলে পুরিয়া ফেলিলেন। তিনি একটিবার পিছনবাগে তাকাইয়াও দেখেন নাই, অথচ ঠিক ফড়িংটির মত রাক্ষসের বাছাকে ধরিয়া বগলে পুরিয়াছেন। রাবণের সঙ্গের রাক্ষসগুলি অবশ্য

তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া বালীকে মারিতে গিয়াছিল, কিন্তু বালীর কয়েকটা হাত পা নাড়া খাইয়াই তাহারা কাঁপিয়া অস্থির, যুদ্ধ আর করিবে কি ?

এদিকে রাবণ বালীর বগলে থাকিয়া প্রাণপণে তাহাকে আঁচড় কামড় দিতেছে, কিন্তু বালীর কাছে তাহা পিঁপড়ার কামড়ের মতও ঠেকিতেছে না। বালী সে সব অগ্রাহ্য করিয়া নিজের সন্ধ্যাবন্দনায় মন দিলেন। দক্ষিণ সাগরের সন্ধ্যা শেষ হইলে, রাবণকে বগলে লইয়াই তিনি শূন্যপথে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া সন্ধ্যা করিতে লাগিলেন। তারপর উত্তর সমুদ্র আর পূর্ব সমুদ্রেও ঠিক সেইরূপ সন্ধ্যা শেষ না করিয়া তিনি কিষ্কিন্ধায় ফিরিলেন না। ততক্ষণে সেই বগলের চাপে আর গন্ধে আর ঘামে রাবণের কি দশা হইয়াছিল, বুঝিয়া লও।

কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া বালী রাবণকে বগল হইতে বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' রাবণ যাতনায় মিটি মিটি চোখে বলিল, 'আমি লঙ্কার রাজা রাবণ, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। আপনি আমাকে পশুর মত ধরিয়া এত পথ ঘুরাইয়া আনিলেন, আপনার কি আশ্চর্য ক্ষমতা! আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিব।' সুতরাং তখন দুজনে বন্ধুতা হইয়া গেল। কাজেই সাজা পাইয়াও রাবণের শিক্ষা হইল না। সে আবার ব্রহ্মাণ্ডময় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কোন ছলে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিয়া একটু বাহাদুরি লইতে পারে কি না।

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার একদিন নারদ মুনির সঙ্গে রাবণের দেখা হইয়াছে। রাবণ বলিল, 'মুনি ঠাকুর, বলুন ত, কোন্ দেশের লোকের গায় সকলের চেয়ে বেশি জোর? তাহাদের সহিত আমি যুদ্ধ কবিব!' মুনি বলিলেন, 'ক্ষিরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ নামে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের লোকের মত বলবান আর ধার্মিক মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।' একথা শুনিবামাত্রই

রাবণ শ্বেতদ্বীপের দিকে পুষ্পক রথ চালাইয়া দিল, মুনিঠাকুরও একটু চিন্তা করিয়া তামাশা দেখিবার জন্যে সেইখানেই চলিয়া গেলেন।

তারপর রাক্ষসেরা ত সিংহনাদ করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সে স্থানের এমনি তেজ যে তাহারা কিছুতেই সেখানে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। হাওয়ায় পুষ্পক রথ উড়াইয়া নিল, রাক্ষসেরা সকলে ভয়ে পলায়ন করিল। তখন রাবণ আর কি করে? সে রথ আর লোকজন সব ছাড়িয়া দিয়া নিজেই গিয়া দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করিল।

সেখানে কয়েকটি মেয়ে বেড়াইতেছিল। তাহারা দেখিল, দশ মাথা আর কুড়ি হাতওয়ালা একটা লোক পথ দিয়া যাইতেছে, আর প্রাণপণে নিজের চেহারাটাকে ভয়ঙ্কর করিবার চেষ্টা করিতেছে। এসব দেখিয়া তাহাদের বড়ই হাসি পাওয়ায় তাহাদের একজন আসিয়া রাবণের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে বাপু? তোমার বাবার নাম কি? এখানে আসিয়াছ কি করিতে?' এ কথায় রাবণের একটু রাগ হইল। সে খুব গম্ভীর সুরে উত্তর দিল, 'আমি বিশ্রবার পুত্র রাবণ। এখানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি, কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।'

শুনিয়া মেয়েরা সকলে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর তাহাদের একজন এক হাতে রাবণের কোমর ধরিয়া অন্য মেয়েদের সামনে গিয়া তাহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, 'দেখ দেখ, আমি কেমন একটা কালো পোকা ধরিয়াছি, এর আবার দশটা মাথা, কুড়িটা হাত!' বলিয়াই সে সেটা আবার আর একজনকে ছুঁড়িয়া দিল, সে আবার দিল আরেক জনের হাতে ছুঁড়িয়া। তখন ত রাবণকে লইয়া খুবই একটা লোফালুফির ধুম পড়িয়া গেল। মেয়েদের তাহাতে আমোদের সীমা নাই, কিন্তু রাবণ বেচারার প্রাণ

লইয়া টানাটানি। কাজেই তখন সে আর কি করে? সে দশমুখের তিনশত বিশ দাঁতে 'কটাশ!' করিয়া একমেয়ের হাতে এক কামড় বসাইয়া দিল। সে মেয়ে ত তখনই 'মা-া-া-া গো-া-া-া-া!' বলিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রাণপণে হাত ঝাড়িতে লাগিল। ততক্ষণে আরেকটি মেয়ে তাহাকে ধরিয়া শূন্যে লইয়া গিয়াছিল, তাহার হাতে সে দিল ভয়ানক আঁচড়াইয়া! সে মেয়েটি তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ছুঁড়িয়া একেবারে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারদমুনি অবশ্য এতক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিলেন, আর আনন্দে অস্থির হইয়া কেবলই হো হো শব্দে হাস্য আর করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছিলেন।

বলা বাহুল্য রাবণের যুদ্ধের সাধ সেদিন সেই সমুদ্রের জল খাইয়াই মিটিয়াছিল।

# ঘ্যাঁঘাসুর

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি, হইয়া অবধি খালি অসুখেই ভুগিতেছে। একটি দিনের জন্যেও ভাল থাকে না। কত বদ্যি, কত ডাক্তার, কত চিকিৎসা, কত ওষুধ—মেয়ে ভাল হইবে দূরে থাকুক, দিন দিনই রোগা হইতেছে। এত ধন জন থাকিয়াও রাজার মনে সুখ নাই। কিসে মেয়েটি ভাল হইবে, তাঁহার কেবল সেই চিন্তা।

এমনি করিয়া দিন যায়; এর মধ্যে একদিন এক সাধু রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি রাজার মেয়ের অসুখের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তোমার মেয়ে একটি লেবু খাইয়া ভাল হইবে।'

একটি লেবু! সে কোন্ লেবুটি, কোথায় কাহার বাগানে তাহা পাওয়া যাইবে, সাধু তাহার কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা আর উপায় না দেখিয়া দেশের লোককে এই কথা জানাইয়া দিলেন যে, 'যাহার লেবু খাইয়া আমার মেয়ে ভাল হইবে, সে আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে, আর আমার রাজ্য পাইবে।'

এখন মুশকিলের কথা এই যে, সে রাজ্যে লেবু মিলে না। কেবলমাত্র এক চাষীর বাড়িতে একটি লেবুর গাছ আছে; চাষী অনেক কষ্ট করিয়া শ্রীহট্ট হইতে সেই গাছটি আনিয়াছিল। সবে সেই বৎসর তাহাতে লেবু হইয়াছে। লেবু তো নয়, যেন রসগোল্লা! এক একটা কত বড়! যেন এক একটা বেল! তেমন লেবু তোমরা দেখও নাই, খাওও নাই। আমিও দেখিতে পাই নাই; দেখিতে পাইলে খাইতে চেষ্টা করা যাইত।

চাষীর তিন ছেলে; যদু, গোষ্ঠ আর মানিক। রাজার হুকুম

শুনিয়া চাষী যদুকে একঝুড়ি লেবু দিয়া বলিল যে, 'শিগ্‌গির এগুলি রাজার বাড়ি নিয়ে যা। এর একটা খেয়ে যদি মেয়ের ব্যামো সারে, তবে রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবি।'

যদু লেবুর ঝুড়ি মাথায় করিয়া রাজার বাড়ি চলিয়াছে, এমন সময় পথে একহাত লম্বা একটি মানুষের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সেই লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার ঝুড়িতে কি ও?' যদু বলিল, 'ব্যাঙ।' সেই লোকটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজার দারোয়ানেরা লেবুর কথা শুনিয়া যারপরনাই আদরের সহিত যদুকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজামহাশয় ব্যস্ত হইয়া নিজেই ঝুড়ির ঢাকা খুলিলেন; আর অমনি চারটি ব্যাঙ তাঁহার পাগড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল। সেই ঝুড়িতে যতগুলি লেবু ছিল, সব কয়টাই ব্যাঙ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং লেবু খাওয়াইয়া রাজার মেয়েকে ভাল করা, আর রাজার জামাই হওয়া, যদুর ভাগ্যে ঘটিল না। সে বেচারা অনেকগুলি লাথি খাইয়া প্রাণে প্রাণে বাড়ি ফিরিল, তাহাই ঢের বলিতে হইবে।

এর পর চাষী আর একঝুড়ি লেবু দিয়া গোষ্ঠকে পাঠাইল। এবারেও সেই একহাত লম্বা মানুষটি কোথা হইতে আসিয়া গোষ্ঠর ঝুড়িতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিল। গোষ্ঠ বলিল, 'ঝিঙের বীচি।' একহাত লম্বা মানুষটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজবাড়ির দারোয়ানেরা প্রথমে গোষ্ঠকে ঢুকিতে দেয় নাই। তাহারা বলিল যে 'তোরই মতন একটা সেদিন এসে রাজামশাইয়ের পাগড়ি নোংরা করে দিয়ে গেছে। তুই আবার একটা কি ক'রে বসবি কে জানে!' অনেক পীড়াপীড়ির পর গোষ্ঠ ঢুকিয়া রাজার মেয়েকে কিরূপ লেবু খাওয়াইল, বুঝিতে পার। সাজাটাও তার তেমনিই হইল।

মানিককে সকলেই একটু বোকা মনে করে। কাজেই তাহাকে

আর লেবুর ঝুড়ি দিয়া রাজার বাড়ি পাঠাইতে কেহ বলিল না। কিন্তু সে যাইবার জন্য একেবারে সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। যতক্ষণ না চাষী তাহাকে যাইতে বলিল, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। শেষটা তাহাকেও এক ঝুড়ি লেবু দিয়া পাঠাইতে হইল।

পথে সেই একহাত লম্বা মানুষের সহিত মানিকেরও দেখা হইল। একহাত লম্বা মানুষ জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝুড়িতে কি ও?' মানিক বলিল, 'ঝুড়িতে লেবু আছে; তাই খেয়ে রাজার মেয়ের অসুখ সারবে।' একহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা তাই হোক।'

রাজবাড়িতে ঢুকিতে মানিকের যারপরনাই মুশকিল হইয়াছিল। অনেক মিনতি আর হাতজোড়ের পর দারোয়ানেরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল আর বলিল, 'দেখিস, যেন ব্যাঙ কি ঝিঙের বীচি-টিচি না হয়। তা হলে কিন্তু তোর প্রাণটা থাকবে না।'

যাহা হউক মানিকের ঝুড়িতে লেবুই পাওয়া গেল। রাজামহাশয় তো খুবই খুশী! তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর লেবু পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, 'কেমন হয়, আমাকে খবর দিস্!' খবরের আশায় রাজামহাশয় বসিয়া আছেন, এমন সময় মেয়ে নিজেই খবর লইয়া উপস্থিত! সেই লেবু মুখে দিতে না দিতেই তাহার অসুখ একেবারে সারিয়া গিয়াছে!

ইহাতে রাজামহাশয় যারপরনাই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার পরেই ভাবিতে লাগিলেন—'তাই তো, করিয়াছি কি। এখন যে চাষীর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে হয়।' এই ভাবিয়া রাজামহাশয় স্থির করিলেন যে, চাষীর ছেলেকে যেমন করিয়াই হউক ফাঁকি দিতে হইবে।

মানিকলাল ভাবিতেছে যে, 'এর পরই বুঝি মেয়ের বিয়ে দিবে।'

এমন সময় রাজামহাশয় তাহাকে বলিলেন, 'বাপু, তুমি কাজটা বেশ ভালই করিয়াছ, কিন্তু রাজার মেয়ে বিবাহ করা সহজ কথা নয়। আগে, আর একখানা কাজ্ করিয়া দাও, তারপর দেখা যাইবে কি হয়। জলে যেমন চলে, ডাঙ্গায়ও তেমনি চলে, এইরূপ একখানা নৌকা আমাকে গড়িয়া না দিতে পারিলে, তোমার কোন আশাই নাই।'

মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় হইল। তারপর বাড়ি আসিয়া সকল কথা বলিল।

বাড়ির সকলেই মানিককে নেহাত বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তাহারা মনে করিল যে, মানকে যখন রাজার মেয়েকে ভাল করিয়া আসিয়াছে, তখন নৌকাখানা ইচ্ছা করিলেই যে-সে তয়ের করিতে পারে।

যদু একখানা কুড়াল লইয়া তখনই নৌকা গড়িতে চলিল। বনের ভিতর হইতে গাছ কাটিয়া সেখানেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ইচ্ছা, সেই দিনই নৌকা প্রস্তুত করিয়া ফেলে ; পরিশ্রমেরও কসুর নাই। এমন সময় কোথা হইতে সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া উপস্থিত। 'কিহে যদুনাথ, কি হচ্ছে ?' 'গামলা।' 'আচ্ছা, তাই হোক।'

'তাই হোক' বলিয়া একহাত লম্বা মানুষ চলিয়া গেল ; যদুও নৌকা গড়িতে লাগিল ! কিন্তু সে যত পরিশ্রম করে তাহার সমস্তই বৃথা হয়। সেই সর্বনেশে কাঠ খালি গামলার মত গোল হইয়া ওঠে, নৌকার মতন কিছুতেই হইতে চায় না। শেষটা যদুর রাগ হইয়া গেল। কিন্তু রাগের ভরে এক কাঠ ফেলিয়া দিয়া, ক্রমাগত আর দুই তিনটা কাঠ লইয়াও গামলা ছাড়া আর কিছু তয়ের করিতে পারিল না। যাহা হউক, গামলাগুলি হইল ভারি সরেস। সুতরাং সন্ধ্যার সময় যদুনাথ গোটা তিন চার গামলা ঘাড়ে করিয়া বাড়ি



ফিরিল ; এমন ভাল গামলাগুলি বনে ফেলিয়া আসিতে কিছুতেই তাহার ইচ্ছা হইল না।

তারপর গোষ্ঠ নৌকা গড়িতে চলিল, আর সেই একহাত লম্বা মানুষের অনুগ্রহে সন্ধ্যাবেলা পাঁচখানি অতিশয় উঁচুদরের লাঙল কাঁধে ঘরে ফিরিল।

অবশ্য, এরপর মানিক নৌকা গড়িতে গেল, আর তাহাকেও সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হচ্ছে ?' মানিক সাদাসিধা উত্তর দিল—'জলে যেমন চলে, ডাঙায়ও তেমনি চলে, এমন একখানা নৌকা গড়ে দিতে পারলে, রাজা মশাই বলেছেন, মেয়ের বিয়ে দেবেন।' এই কথা শুনিয়া একহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা তাই হোক।'

মানিক সবে নৌকার কাঠ কাটিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছিল। একহাত লম্বা মানুষের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই কাঠ ছুটিয়া চলিয়াছে। সে আর এখন কাঠ নাই ; অতি চমৎকার একখানা নৌকা। তাহাতে দাঁড়ি নাই, মাঝি নাই, দাঁড় নাই, পাল নাই। যেখানে যাইবার দরকার, তাহা নিজেই বুঝিয়া লয়, সেখানে সে নিজেই থামে। রাজা-রাজড়ার উপযুক্ত মখমলের গদি-তাকিয়ায় তাহার ভিতরটা সাজানো। বাহিরটা দেখিতে কি সুন্দর, তা কি বলিব। যে জিনিসে তাহা সাজাইয়াছে, তাহা সেই একহাত লম্বা মানুষের দেশে হয় ; আমি তাহার নাম জানি না।

রাজামহাশয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মানিকলালের নৌকা সেইখানে গিয়া উপস্থিত। সকলে নৌকার রূপগুণ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, আর কত প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা মহাশয়ও খুব আশ্চর্য না হইয়াছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া মুখে মানিককে বলিলেন, 'এতেও হচ্ছে না ; আর

একখানা কাজ করিয়া দিতে হবে। একগাছ ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের পালক হইলে আমার মুকুটের বেশ শোভা হয়। এই জিনিসটি আনিয়া দিলে নিশ্চয় আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবে।' মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঘ্যাঁঘাসুরের পালক আনিতে চলিল।

খানিকটা পাখী, খানিকটা জানোয়ার, বিদঘুটে চেহারা, খিটখিটে মেজাজ, ভারি জ্ঞানী, বেজায় ধনী, অসুর ঘ্যাঁঘা মহাশয়, এক মাসের পথ দূরে, অজানা নদীর ধারে, অচেনা শহরে, সোনার পুরীতে বাস করেন। মানুষটিকে দেখিতে পাইলেই, রসগোল্লার মত টপ্ করিয়া তাহাকে গিলেন। সেই ঘ্যাঁঘা মহাশয়ের পালক আনিতে মানিক চলিয়াছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকের পথ জিজ্ঞাসা করে; আর ডাইনে বাঁয়ে না চাহিয়া ক্রমাগত সেই পথে চলে। রাত্রি হইলে কাহারও বাড়িতে আশ্রয় লয়; আবার সকালে উঠিয়া চলিতে থাকে।

ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকে যাইতেছে শুনিয়া, সকলেই তাহাকে আদর করিয়া জায়গা দেয়। একদিন রাত্রিতে এইরূপে সে একজন খুব ধনী লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে। সেই ধনী অনেক কথাবার্তার পর তাহাকে বলিল, 'বাপু, তুমি ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে চলেছ শুনছি, সে অনেক বিষয়ের খবর রাখে। আমার লোহার সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি; ঘ্যাঁঘা তার কোন সন্ধান বলতে পারে কিনা, জিজ্ঞাসা কোরো তো।' মানিক বলিল, 'আচ্ছা মশাই, আমি জেনে আসব।' আর একদিন সে আর এক বড়লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে; সেই বড়লোকের মেয়ের ভারি অসুখ। তাহার বেয়ারামটা যে কি কোনো ডাক্তার কবিরাজ তাহা ঠিক করিতে পারে না। মেয়ে দিন দিন খালি রোগা হইয়া যাইতেছে। সেই বড়লোক মানিককে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া তারপর বলিলেন, 'আমার মেয়ের অসুখ কিসে সারবে এই

কথাটা যদি ঘ্যাঁঘার কাছ থেকে জেনে আসতে পার, তবে বড় উপকার হয়।' মানিক বলিল, 'অবিশ্যি মশাই, আমি নিশ্চয় জেনে আসব।'

এইরূপে একমাস চলিয়া মানিক অজানা নদীর ধারে আসিয়া ওপারে ঘ্যাঁঘাসুরের সোনার বাড়ি দেখিতে পাইল। অজানা নদীর নৌকা নাই, খেয়া নাই; এক বুড়ো সকলকেই কাঁধে করিয়া পার করে। মানিকও তাহারি কাঁধে চড়িয়া নদী পার হইল। বুড়ো তাহাকে বলিল, 'বাপু, আমার এই দুঃখু কবে দূর হবে, ঘ্যাঁঘার কাছে জিজ্ঞেস কোরো তো! আমার খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, খালি কাঁধে ক'রে দিনরাত্তির মানুষই পার করছি। ছেলেবেলা থেকে এই করছি, আর এখন বুড়ো হয়ে গেছি।' মানিক বলিল, 'তোমার কিছু ভয় নেই, আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করব।'

নদী পার হইয়া মানিক ঘ্যাঁঘার বাড়িতে গেল। ঘ্যাঁঘা তখন বাড়ি ছিল না; ঘেঁঘী ছিল। ঘেঁঘী তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'পালা বাছা, শিগ্‌গির পালা। ঘ্যাঁঘা তোকে দেখতে পেলেই গিল্‌বে।' মানিক বলিল, 'আমি যে ঘ্যাঁঘার লেজের একগাছি পালক চাই। সেটি না নিয়ে কেমন ক'রে যাব? আর সেই যাদের চাবি হারিয়ে গেছে সেই চাবিটি কোথায় আছে? আর যাদের মেয়ের অসুখ, তারা ওষুধ জেনে যেতে বলেছে। আর যে বুড়ো পার ক'রে দিলে, সে বাড়ি যাবে কেমন ক'রে?'

ঘেঁঘী বলিল, 'প্রাণটি নিয়ে কোথায় পালাবে, না আবার তার পালক চাই, আর তাকে একশ খবর বলে দাও। তুই কে রে বাপু?' মানিক বলিল, 'আমি মানিক। পালক না নিয়ে গেলে রাজা মেয়ে বিয়ে দেবে না; একগাছি পালক আমার চাই।'

হাজার হোক স্ত্রীলোক। মানিককে দেখিয়া ঘেঁঘীর দয়া হইল। সে বলিল, 'আচ্ছা বাপু, তাহলে তুই এই খাটের তলায় লুকিয়ে

থাক্। তোর ভাগ্যে থাকলে হবে এখন।' মানিক ঘ্যাঁঘার খাটের তলায় লুকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘ্যাঁঘাসুর বাড়ি আসিল। ঘেঁঘী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জলটল দিয়া সোনার থালায় খাবার হাজির করিল। ঘ্যাঁঘার মেজাজটা বড়ই খিটখিটে; সবটাতেই সে দোষ ধরে। বাড়ি আসিয়াই সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, 'মানুষের গন্ধ কোত্থেকে এল? হুঁ হুঁ—মানুষের গন্ধ। মানুষ দে, খাই।'

ঘ্যাঁঘার কথা শুনিয়া খাটের তলায় মানিকলালের মুখ শুকাইয়া গেল, ঘেঁঘীরও বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। সে অনেক কৌশল করিয়া ঘ্যাঁঘাকে বুঝাইল যে, একটা মানুষ আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা ঘ্যাঁঘার নাম শুনিয়াই পালাইয়াছে। ইহাতে ঘ্যাঁঘা কিছু শান্ত হইয়া খাবার খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইলে, ঘ্যাঁঘা খাটে শুইয়া নিদ্রা গেল। ঘুমের ভিতর তাহার লম্বা লেজটি লেপের বাহিরে আসিয়া খাটের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই লেজের আগায় অতি চমৎকার পালকের গোছা। মানিক খাটের তলায় অপেক্ষা করিয়া আছে; লেজ দেখিয়াই সে খ্যাঁচ করিয়া একটি পালক ছিঁড়িয়া লইল। অমনি ঘ্যাঁঘা ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, 'ঘেঁঘী, আমার লেজ ধরে যেন কে টানলে। হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ!'

ঘেঁঘী বলিল, 'তোমার ভুল হইয়াছে। অত বড় পালকের গোছা কোথায় আটকে লেজে টান পড়েছে। আর মানুষ তো একটা এসেছিল বলেছি, এ তারই গন্ধ। সেই মানুষটা কত কথা বললে। সেই কাদের বাড়ি লোহার সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গেছে—' ঘেঁঘীর কথা শেষ হইতে না দিয়াই ঘ্যাঁঘা বলিল, 'হাঁ হাঁ! সেই লোহার সিন্দুকের চাবি! আমি জানি। সেটাকে তাদের খোকা গদির

ফুটোর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।' ঘেঁঘী বলিল, 'আবার কাদের মেয়ের কি অসুখ—।' অমনি ঘ্যাঁঘা বলিল, 'কোনো ব্যাঙে ওর চুল নিয়ে গেছে; ঘরের কোণেই তার গর্ত। ঐখান থেকে খুঁড়ে সেই চুল আনলেই মেয়ের ব্যামো সারবে।' আবার ঘেঁঘী বলিল, 'যে লোকটা মানুষ ঘাড়ে করে নদী পার করে—?' ঘ্যাঁঘা বলিল, সেটা একটা মস্ত গাধা! একজনকে কেন নদীর মাঝখানে নামিয়ে দেয় না! তাহলেই তো সে বাড়ি যেতে পাবে। যাকে নামিয়ে দেবে সে-ই মানুষ পার করতে থাকবে!'

মানিকের সকল কাজই আদায় হইল। এখন রাত পোহাইলে ঘ্যাঁঘা বাহিরে চলিয়া যায়, আর সেও বাহিরে আসিতে পারে। রাত ভোর হইলে ঘ্যাঁঘা জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইল; ঘেঁঘীও মানিককে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিল।

এর পর প্রথমেই সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কিছু হল?' মানিক বলিল, 'সে হবে এখন, আগে পার কর; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি।' বুড়ো মানিককে কাঁধে করিয়া পারে লইয়া গেলে পর ডাঙায় উঠিয়া মানিক বলিল, 'এর পর একজনকে মাঝখানে নামিয়ে দিয়ো; তা হলেই তোমার ছুটি।' এই কথা শুনিয়া বুড়ো মানিককে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, 'ভাই, তুমি আমার এমন উপকারটা করলে; আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে আর দু'বার কাঁধে করে পার করি।' মানিক বলিল, 'তুমি দয়া করে যা করেছ তাই ঢের; আর আমার বুড়ো মানুষের কাঁধে চড়ে কাজ নেই। আমি এখন দেশে চললাম।'

চারদিন চলিয়া মানিক, যাহাদের মেয়ের অসুখ ছিল, তাহাদের বাড়িতে আবার অতিথি হইল। বাড়ির কর্তা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘ্যাঁঘা কিছু বলেছে?' মানিক বলিল, 'হ্যাঁ।' এই বলিয়া সে ঘরের কোণ হইতে কোনো ব্যাঙের গর্ত

থাক্। তোর ভাগ্যে থাকলে হবে এখন।' মানিক ঘ্যাঁঘার খাটের তলায় লুকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘ্যাঁঘাসুর বাড়ি আসিল। ঘেঁঘী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জলটল দিয়া সোনার থালায় খাবার হাজির করিল। ঘ্যাঁঘার মেজাজটা বড়ই খিটখিটে; সবটাতেই সে দোষ ধরে। বাড়ি আসিয়াই সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, 'মানুষের গন্ধ কোত্থেকে এল? হুঁ হুঁ—মানুষের গন্ধ। মানুষ দে, খাই।'

ঘ্যাঁঘার কথা শুনিয়া খাটের তলায় মানিকলালের মুখ শুকাইয়া গেল, ঘেঁঘীরও বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। সে অনেক কৌশল করিয়া ঘ্যাঁঘাকে বুঝাইল যে; একটা মানুষ আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা ঘ্যাঁঘার নাম শুনিয়াই পালাইয়াছে। ইহাতে ঘ্যাঁঘা কিছু শান্ত হইয়া খাবার খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইলে, ঘ্যাঁঘা খাটে শুইয়া নিদ্রা গেল। ঘুমের ভিতর তাহার লম্বা লেজটি লেপের বাহিরে আসিয়া খাটের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই লেজের আগায় অতি চমৎকার পালকের গোছা। মানিক খাটের তলায় অপেক্ষা করিয়া আছে; লেজ দেখিয়াই সে খ্যাঁচ করিয়া একটি পালক ছিঁড়িয়া লইল। অমনি ঘ্যাঁঘা ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, 'ঘেঁঘী, আমার লেজ ধরে যেন কে টানলে। হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ!'

ঘেঁঘী বলিল, 'তোমার ভুল হইয়াছে। অত বড় পালকের গোছা কোথায় আটকে লেজে টান পড়েছে। আর মানুষ তো একটা এসেছিল বলেছি, এ তারই গন্ধ। সেই মানুষটা কত কথা বললে। সেই কাদের বাড়ি লোহার সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গেছে—' ঘেঁঘীর কথা শেষ হইতে না দিয়াই ঘ্যাঁঘা বলিল, 'হাঁ হাঁ! সেই লোহার সিন্দুকের চাবি! আমি জানি। সেটাকে তাদের খোকা গদির

ফুটোর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।' ঘেঁঘী বলিল, 'আবার কাদের মেয়ের কি অসুখ—।' অমনি ঘ্যাঁঘা বলিল, 'কোনো ব্যাঙে ওর চুল নিয়ে গেছে; ঘরের কোণেই তার গর্ত। ঐখান থেকে খুঁড়ে সেই চুল আনলেই মেয়ের ব্যামো সারবে।' আবার ঘেঁঘী বলিল, 'যে লোকটা মানুষ ঘাড়ে করে নদী পার করে—?' ঘ্যাঁঘা বলিল, সেটা একটা মস্ত গাধা! একজনকে কেন নদীর মাঝখানে নামিয়ে দেয় না! তাহলেই তো সে বাড়ি যেতে পাবে। যাকে নামিয়ে দেবে সে-ই মানুষ পার করতে থাকবে!'

মানিকের সকল কাজই আদায় হইল। এখন রাত পোহাইলে ঘ্যাঁঘা বাহিরে চলিয়া যায়, আর সেও বাহিরে আসিতে পারে। রাত ভোর হইলে ঘ্যাঁঘা জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইল; ঘেঁঘীও মানিককে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিল।

এর পর প্রথমেই সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কিছু হল?' মানিক বলিল, 'সে হবে এখন, আগে পার কর; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি।' বুড়ো মানিককে কাঁধে করিয়া পারে লইয়া গেলে পর ডাঙায় উঠিয়া মানিক বলিল, 'এর পর একজনকে মাঝখানে নামিয়ে দিয়ো; তা হলেই তোমার ছুটি।' এই কথা শুনিয়া বুড়ো মানিককে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, 'ভাই, তুমি আমার এমন উপকারটা করলে; আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে আর দু'বার কাঁধে করে পার করি।' মানিক বলিল, 'তুমি দয়া করে যা করেছ তাই ঢের; আর আমার বুড়ো মানুষের কাঁধে চড়ে কাজ নেই। আমি এখন দেশে চললাম।'

চারদিন চলিয়া মানিক, যাহাদের মেয়ের অসুখ ছিল, তাহাদের বাড়িতে আবার অতিথি হইল। বাড়ির কর্তা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘ্যাঁঘা কিছু বলেছে?' মানিক বলিল, 'হ্যাঁ।' এই বলিয়া সে ঘরের কোণ হইতে কোনো ব্যাঙের গর্ত

খুঁড়িয়া যেই চুল বাহির করিল, আর অমনি যে মেয়ে দুই বৎসর যাবৎ মড়ার মতন পড়িয়াছিল, সে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে বাড়ির সকলে যে কত খুশী হইল, তাহা কি বলিব ! মানিককে তাহারা এত টাকা দিল যে, দশটা উটে তাহা বহিতে পারে না।

যাহাদের চাবি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহারাও চাবি পাইয়া মানিককে ঢের টাকাকড়ি দিল। এই সমস্ত টাকাকুড়ি লইয়া সে দেশে ফিরিয়া রাজামহাশয়কে ঘ্যাঘাস্থরের পালক বুঝাইয়া দিল। দেশের সকল লোক ইহাতে মানিকের যারপরনাই প্রশংসা করিল। তাহারা সকলেই বলিল যে, মানিককে এত ক্লেশ দেওয়া রাজার ভারি অন্যায় হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে আর দেরি করা উচিত নয়। রাজা মহাশয় আর কি করেন, শেষটা অনেক কষ্টে রাজি হইলেন।

তারপর খুব জাঁকজমকের সহিত রাজকন্যা ও মানিকের বিবাহ হইল। মানিক এত টাকাকড়ি লইয়া আসিয়াছে যে, তাহাতেই তাহার পরম সুখে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু রাজামহাশয়ের ইহাতে ভারি হিংসা হইল। তিনি মনে করিলেন যে, 'ঘ্যাঘাস্থরের দেশে গেলে যদি এত টাকা নিয়ে আসা যায়, তবে আমিও সেইখানে যাব।'

এই ভাবিয়া রাজামহাশয় ঘ্যাঘার মুল্লুকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে পোঁছাইতে পারেন নাই। কারণ অজানা নদী পার হইবার সময়, সেই বুড়ো তাঁহাকে মাঝখানে নামাইয়া দিল। রাজামহাশয় প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন, তারপর বুড়োকে গালি দিতে লাগিলেন, তারপর হাতজোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুড়ো তাঁহার কথায় কান দিবার অবসরই পায় নাই, ততক্ষণ সে ডাঙ্গায় উঠিয়া উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি পানে ছুটিয়াছে,

তাড়াতাড়ি রাজামহাশয়কে ছুটি পাইবার কৌশলটি বলিয়া দিবার কথা তাহার মনে হয় নাই। সুতরাং রাজামহাশয় আজও সেই স্থানেই মানুষ পার করিতেছেন।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেহ যদি কখনও ঘ্যাঁঘাস্থরের মুল্লুকে যান, তাহা হইলে দয়া করিয়া বেচারাকে সেই কথাটা বলিয়া দিবেন। কিন্তু পুনরায় নদীর এপারে ফিরিয়া না আসিয়া এ কথা বলিবেন না, কারণ তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতে পারে।

# সাতমার পালোয়ান

এক রাজার দেশে এক কুমার ছিল ; তার নাম ছিল কানাই।

কানাই কিছু একটা গড়িতে গেলেই তাহা বাঁকা হইয়া যাইত ; কাজেই তাহা কেহ কিনিত না। কিন্তু তাহার স্ত্রী খুব সুন্দর হাঁড়ি কলসী গড়িতে পারিত। ইহাতে কানাইয়ের বেশ সুবিধা হইবারই কথা ছিল। সে সকল মেহন্নত তাহার স্ত্রীর ঘাড়ে ফেলিয়া সুখে বেড়িয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড়ই রাগী ছিল, কানাইকে আলস্য করিতে দেখিলেই সে ঝাঁটা লইয়া আসিত। সুতরাং মোটের উপর বেচারার কষ্টই ছিল বলিতে হইবে।

একদিন কানাইয়ের স্ত্রী কতকগুলি হাঁড়ি রোদে দিয়া বলিল, 'দেখ যেন কিছুতে মাড়ায় না।'

কানাই কিছু চিঁড়ে আর ঝোলাগুড় এবং একটা লাঠি লইয়া হাঁড়ি পাহারা দিতে বসিল। এক-একবার চিঁড়ে খায় আর এক-একবার হাঁড়ির পানে তাকাইয়া দেখে, কিছুতে মাড়াইল কিনা।

কানাইয়ের ঝোলাগুড়ের খানিকটা কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়াছিল, অনেকগুলি মাছি আসিয়া তাহা খাইতে বসিয়া গেল। কানাই তাহা দেখিয়া বলিল, 'বটে ! হাঁড়ি মাড়াচ্ছ ? আচ্ছা, রোসো !' এই বলিয়া সে তাহার লাঠি দিয়া মাছিগুলোকে এমনি এক ঘা লাগাইল যে তাহাতে মাছিও মরিয়া গেল, হাঁড়িও গুঁড়া হইয়া গেল।

কানাই গনিয়া দেখিল যে, সাতটা মাছি মরিয়াছে। তাহাতে সে লাঠি বগলে করিয়া ভারি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। হাঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রী ঝাঁটা হাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কী হয়েছে ?' কানাই কথা কয় না। তাহার স্ত্রী যতই জিজ্ঞাসা করে, সে খালি আরও গম্ভীর হইয়া যায়।

শেষটা যখন তাহার স্ত্রী বাড়াবাড়ি করিল, তখন সে চোখ লাল করিয়া বলিল, 'দেখ্, হিসেব করে কথা কোস। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

কানাই আর কাহারও সঙ্গে কথা কয় না। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে খালি বলে, 'হিসেব করে কথা কোস্। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস্?'

শেষে একদিন কানাই একথান মার্কিন দিয়া মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিল। বনের ভিতর হইতে বাঁশ কাটিয়া একটা ভয়ানক মোটা লাঠি তয়ের করিল। তারপর পিরান গায়ে দিয়া কোমর বাঁধিয়া, ঢাল হাতে করিয়া, জুঁতা পায় দিয়া, রাজার বাড়িতে পালোয়ানগিরি করিতে চলিল। যাইবার সময় তাহার স্ত্রীকে বলিয়া-গেল—'আমি আর তোদের এখানে থাকব না। আমি এক ঘায় সাতটা মারতে পারি।'

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে, 'কানাই, কোথায় যাও?' কানাই সে কথার কোন উত্তর দেয় না। সে মনে করিয়াছে যে এখন হইতে আর কানাই বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিবে না। সে এক ঘায় সাতটা মারিয়া ফেলিয়াছে! এখন কি আর তাহাকে কানাই ডাকা সাজে? এখন তাহাকে বলিতে হইবে 'সাতমার পালোয়ান।'

রাজার নিকট গিয়া কানাই জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার সেই এক থান মার্কিনের পাগড়ি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কী হে?' কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমার নাম সাতমার পালোয়ান। আমি এক ঘায় সাতটাকে মারতে পারি।'

কানাই রাজার বাড়িতে পালোয়ান নিযুক্ত হইল। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। এখন তার দিন সুখেই যায়।

ইহার মধ্যে একদিন সেই রাজার দেশে এক বাঘ আসিয়া

উপস্থিত। সে মানুষ মারিয়া, গরু বাছুর খাইয়া, দৌরাত্ম্য করিয়া দেশ ছারখার করিবার য়োগাড় করিল। যত শিকারী তাহাকে মারিতে গেল, সব কটাকে সে জলযোগ করিয়া ফেলিল। রাজা-মহাশয় অবধি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'দেশ আর থাকে না।'

এমন সময় কোথাকার এক দুষ্ট লোক আসিয়া রাজার কানে কানে বলিল, 'রাজামহাশয়, এত যে ভাবছেন, তবে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পালোয়ান রেখেছেন কী করতে? তাকে ডেকে কেন বাঘ মেরে দিতে হুকুম করুন না।'

রাজা বলিলেন, 'আরে তাই তো! ডাক্ পালোয়ানকে!'

রাজার তলব পাইয়া কানাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন, 'সাতমার পালোয়ান, তোমাকে ঐ বাঘ মেরে দিতে হবে। নইলে তোমার মাথা কাটব।'

কানাই লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা মহারাজ, এখনি যাচ্ছি।'

ঘরে আসিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায়, হায়! এমন সুখের চাকরিটা আর রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি প্রাণটাও যায়? কানাই বলিল, 'এখন আর কি? বাঘ মারতে গেলে বাঘে খাবে, না গেলে রাজা মারবে। দূর হোক গে, আমি আর এদেশে থাকব না।'

সেদিন সন্ধ্যার পর কানাই তাহার পাগড়িটা মাথায় জড়াইল, কোমরটা আঁটিয়া বাঁধিল। এক হাতে ঢাল, আর-এক হাতে ডাণ্ডা, পিঠে পুঁটুলি, পায়ে নাগরা জুতো। সকলে মনে করিল, সাতমার পালোয়ান বাঘ মারিতে চলিয়াছে। কানাই মনে করিল, রাজার দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভালো। একটা ঘোড়া হইলে আরও শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া হইত।

ততক্ষণে বাঘ করিয়াছে কি—এক বুড়ীর ঘরের পিছনে চুপ মারিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছাটা,—বুড়ী কিংবা তাহার নাতনী একটিবার বাহিরে আসিলেই ধরিয়া খাইবে। বুড়ী ঘরের ভিতরে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছে। তাহার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। এতক্ষণে যে কখন ঘুমাইয়া পড়িত, খালি নাতনীটার জ্বালায় পারিতেছে না। বুড়ী অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারে নাই। শেষে রাগিয়া বলিল, 'তোকে বাঘে ধরে নেবে।' নাতনী বলিল, 'আমি বাঘে ভয় করি না।' বুড়ী বলিল, 'তবে তোকে টঁ্যাপায় নেবে।'

বাস্তবিক টঁ্যাপা বলিতে একটা কিছু নাই, বুড়ী তাহার নাতনীকে ভয় দেখাইবার জন্যই ঐ নামটা তয়ের করিয়াছিল। কিন্তু বাঘ ঘরের পিছন হইতে টঁ্যাপার নাম শুনিয়া ভারি ভয় পাইয়া গেল! সে মনে মনে বলিল, 'বাস রে! আমাকে ভয় করে না, কিন্তু টঁ্যাপাকে ভয় করবে! সেটা না জানি তবে কেমন ভয়ংকর জানোয়ার। যদি একবার সেই জানোয়ারটা এই দিক দিয়ে আসে, তা হলেই তো মুশকিল দেখছি!'

অন্ধকারে বসিয়া বাঘ এইরূপ ভাবিতেছে, আর ঠিক এমনি সময় কানাই সেই পথে পলায়ন করিতেছে। বাঘকে দেখিয়া কানাই মনে মনে ভাবিল, 'বাঃ, এই তো একটা ঘোড়া বসে আছে!' এই বলিয়াই সে কোমরের কাপড়টা খুলিয়া বাঘের গলায় বাঁধিল।

অন্ধকারে বাঘকে কানাই ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। বাঘও কানাইকে তাহার পাগড়ি-টাগড়ি সুদ্ধ একটা নিতান্তই অদ্ভুত জন্তুর মতন দেখিল। একটা মানুষ হঠাৎ আসিয়া যে তার মতন জন্তুর সামনে এতটা বেয়াদবি করিয়া বসিবে, এ কথা তার মাথায় ঢুকে নাই। সে বেচারা নেহাত ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল—'এই রে, মাটি করেছে। আমাকে টঁ্যাপায় ধরেছে!'

কানাই ভাবিল, 'ঘোড়া যখন পেয়েছি, তখন আর তাড়াতাড়ি কিসের? ঘরে একটু ঘুমুই, তারপর শেষরাত্রে ঘোড়ায় চড়ে ছুট দেব।' এই ভাবিয়া সে বাঘকে তাহার বাড়ির পানে টানিয়া লইয়া চলিল। বাঘ বেচারা আর কী করে! সে মনে করিল, 'এখন টঁ্যাপার হাতে পড়েছি, এর কথা মতনই চলতে হবে।'

বাড়ি আসিয়া কানাই বাঘকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া দরজা আঁটিয়া দিল। তারপর বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, 'শেষ রাত্রেই উঠে পালাব।'

কানাইয়ের ঘুম ভাঙিতে ফরসা হইয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘোড়া আনিতে গিয়া দেখে—সর্বনাশ! বাঘ যে ঘরে বন্ধ আছে! বাহিরে আসিয়া তাহাকে খাইতে পারিবে না, সে কথা তখন তাহার মনেই হইল না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া দরজায় হুড়কা আঁটিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এদিকে সকালবেলা সকলে সাতমার পালোয়ানের বাড়িতে খবর লইতে আসিয়াছে, বাঘ মারা হইল কিনা। তাহারা আসিয়া দেখিল যে, বাঘ ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে বলিল, 'রাজামশাই, দেখুন এসে, সাতমার পালোয়ান বাঘকে ধরে এনে ঘরে বেঁধে রেখেছে!'

রাজামহাশয় আশ্চর্য হইয়া সাতমার পালোয়ানের বাড়ি চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে সত্য সত্যই বাঘ ঘরে বাঁধা। ততক্ষণে কানাই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আসিয়া রাজামহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজা বলিলেন, 'সাতমার, ওটাকে মার নি কেন?'

কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমি এক ঘায় সাতটাকে মারি, ও যে শুধু একটা!'

এখন হইতে সাতমার পালোয়ানের নাম দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া

গেল। রাজামহাশয় যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাইনে পাঁচ শত টাকা করিয়া দিলেন। কানাইয়ের দিন খুব সুখেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু সুখের দিন কি চিরকাল থাকে? দেখিতে দেখিতে কানাইয়ের আর-এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এবারে বাঘ নয়, আর-একটা রাজা। সে অনেক হাজার সৈন্য লইয়া এই রাজার দেশ লুটিতে আসিয়াছে। এ রাজাটা নাকি বড়ই ভয়ানক লোক, তাহার সঙ্গে কিছুতেই আঁটা যায় না।

রাজামহাশয় বলিলেন, 'সাতমার, এখন উপায়? তুমি না বাঁচালে আমার আর রক্ষে নেই। তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দেব, যদি এবার বাঁচিয়ে দিতে পার।'

কানাই বলিল, 'রাজামশাই, কোন চিন্তা করবেন না, এই আমি যাচ্ছি! আমাকে একটা ভাল ঘোড়া দিন।'

রাজার হুকুমে সরকারী আস্তাবলের সকলের চাইতে ভাল যুদ্ধের ঘোড়াটি আনিয়া কানাইকে দেওয়া হইল।

কানাই আজ দুই থান মার্কিন দিয়া পাগড়ি বাঁধিল। পোশাকটাও দস্তুরমতন করিল। মনে মনে কিন্তু তাহার মতলব এই যে, যুদ্ধে যাইবার ভান করিয়া একবার ঘোড়ার পিঠে চড়িতে পারিলেই পলায়নের সুবিধা হয়।

কিন্তু হায়, সেটা যে যুদ্ধের ঘোড়া কানাই তাহা জানিত না। সে বেচারা যতই ঘোড়াটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে চায়, ঘোড়া কিছুতে রাজী হয় না। যুদ্ধের বাজনা শুনিয়া ঘোড়া যখন নাচিতে লাগিল, কানাইয়ের তখন পিঠে টিকিয়া থাকা ভার হইল। শেষে ঘোড়া তাহার কোন কথা না শুনিয়া একেবারে যুদ্ধের জায়গায় গিয়া উপস্থিত। পথে কানাই লতাপাতা গাছপালা খড়ের গাদা যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা

করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সে ঘোড়া থামিল না। সেই গাছপালা আর খড়ের গাদা সবসুদ্ধই সে কানাইকে লইয়া ছুটিল।

এদিকে সেই বিদেশী রাজার সৈন্যেরা শুনিতে পাইয়াছে যে, এদেশে একটা সাতমার পালোয়ান আছে, সে এক ঘায় সাতটাকে মারে—বাঘকে ধরিয়া আনিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখে! এ কথা শুনিয়াই তাহারা বলাবলি করিতেছে যে, 'ভাই, ওটা আসিলে আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করা হইবে না। বাপরে, এক ঘায় সাতটাকে মারিবে!'

এমন সময় সাতমারের ঘোড়া সেই দুই থান মার্কিনের পাগড়ি আর সেই সব গাছপালা আর খড়ের গাদা সুদ্ধ সাতমারকে লইয়া আসিয়া দেখা দিল! দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একটা পাহাড়-পর্বত ছুটিয়া আসিতেছে। বিদেশী রাজার সৈন্যেরা তাহা একবার দেখিয়া আর দুবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। একজন যেই চেঁচাইয়া বলিল, 'ঐ রে আসছে। এবারে গাছ পাথর ছুঁড়ে মারবে।' অমনি মুহূর্তের মধ্যে সেই হাজার হাজার সৈন্য চেঁচাইতে চেঁচাইতে কোথায় ছুটিয়া পলাইল তাহার ঠিকানা নাই।

কানাই দেখিল যে বিদেশী সৈন্য সব পলাইয়াছে, খালি তাহাদের রাজাটা ছুটিতে পারে নাই বলিয়া ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কানাই মনে মনে ভাবিল, 'এ তো মন্দ নয়! পালাতে চলেছিলুম, মাঝখান থেকে কেমন করে যুদ্ধ জিতে গেলুম! এখন রাজাটাকে বেঁধে নিলেই হয়!'

আর কি! এখন তো সাতমার পালোয়ানের জয়জয়কার! অর্ধেক রাজ্য পাইয়া এখন সে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

s pre-
red
ved on

and
by
ons in
public
were,

## Suspended

From Our Staff Correspondent

DARJEELING, July 25.—Passengers stranded at New Jalpaiguri station were transported this morning to nearby destinations and railheads by a fleet of buses ... the district ad-

## Growth-Oriented

—SWAMINATHAN

NEW DELHI, July 25.—The new industrial licensing policy, designed to secure certain social objectives, is essentially growth-orient- described as a "retrograde step" the latest Government notification barring larger industrial houses from undertaking diversification

## Communal

By a Staff Reporter

REPLYING to a civic reception accorded to him by Calcutta